প্রহেলিকা-সিরিজ—৭ নং

কবরের নীচে

·এক ঝট্‌কায় তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন···

পৃষ্ঠা—৩২

কবরের নীচে

এক

টেলিফোনের রিসিভারটা হাত থেকে নামিয়ে রাখতে রাখতে সমীর বললে, "তাহলে তৈরি হয়ে নাও হীরেন। ইনস্পেক্টর বীরেনবাবু আসছেন এখনই। তিনি একটা ভৌতিক-রহস্যের সমাধান করাতে চান আমাকে দিয়ে।"

হেসে জবাব দিলে হীরেন। সে বললে, "তাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে বল! ইহকালের চোর-ডাকাত ধরে গোয়েন্দা সমীর বোসের যা সুনাম হয়েছে, তাতে আগেই ধারণা করা উচিত ছিল যে, একদিন পরকালের চোর-ডাকাতের জন্যেও তোমার তলব হবে।"

"হ্যাঁ, তাই-ই হয়েছে বটে ; কিন্তু পরকালের সেই খবর বা তলবটা জারী করতে আসছেন, আমাদেরই মত রক্ত-মাংসের মানুষ—ইন্স্পেক্টর বীরেন দত্ত..."

সমীর আরো কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাইরে কার ভারী পায়ের শব্দে সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌ল। হীরেন বললে, "নিশ্চয়ই বীরেনবাবুর আগমন হয়েছে।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে বীরেনবাবু তাঁর বিশাল দেহটি নিয়ে ব্যস্তভাবে এসে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন যুবক।

সমীর আর হীরেন জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে বীরেনবাবুর দিকে তাকালে। বীরেনবাবু একটা চেয়ারে বসে পড়ে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জলদ্‌গম্ভীরস্বরে বললেন, "সব বলছি। পাকা তিন মাইল রাস্তা ঘোড়দৌড় করে এসেছি, আগে একটু জিরোতে দাও।"

সমীর বীরেনবাবুর সঙ্গীর দিকে তাকালে। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। চুল উস্কোখুস্কো, চোখের চাউনি তীব্র হলেও তাতে একটা ভয় এবং বিহ্বলতা মেশানো রয়েছে। দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এমন একটা কিছু ঘটেছে যার আঘাত তিনি তখনও ভাল ভাবে সামলে উঠতে পারেন নি।

বীরেনবাবু একটু কেসে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমার এই সঙ্গীকে দেখে তোমরা অবাক্ হয়েছ বুঝতে পারছি, কিন্তু প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, ইনি আমার বক্তব্যের অন্যতম নায়ক। এঁর বিশিষ্ট বন্ধু এবং এই কাহিনীর মূল

নায়ক অদৃশ্য হয়েছেন এবং সেইজন্যেই আমার এতটা রাস্তা ঘোড়দৌড় করে তোমার কাছে ছুটে আসা।"

তারপর একটু দম নিয়ে বীরেনবাবু বলে চললেন, "এখন আসল ঘটনাটা শোনো। এঁর নাম অরুণকুমার বোস। দিন-তিনেক আগে ইনি আর এঁর বন্ধু অজিত রায় নীলপুরের জঙ্গলে যান শিকার করতে। এত জায়গা থাকতে সেই কুখ্যাত নীলপুরেই যে এঁরা কেন শিকার করতে গেলেন, এ-কথার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। 'কুখ্যাত' বলছি এইজন্যে যে, বহুকাল আগে এই নীলপুরই ছিল অত্যাচারী নর-পশু নীল-চাষীদের একটা প্রধান আড্ডা। এই জায়গায় তখন অসংখ্য নীলকুঠী ছিল আর তার মালিকরা ছিল সম্পূর্ণ অভারতীয় বিদেশী। এখানকার কুঠীয়ালদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল পর্ত্তুগীজ-দেশীয়। তাদের অত্যাচার এত চরমে উঠেছিল যে, তখন এই নীলপুরের নাম শুনলে লোকে আতঙ্কে শিউরে উঠত। এইসব নীল-চাষীদের ভেতরে অনেকেই আবার ডাকাতি করে অর্থ উপার্জ্জন করত, এতে তাদের বিবেকে বিন্দুমাত্রও আঘাত লাগত না। এইসব নানা কারণে এই নীলপুরের অখ্যাতি চরমে উঠেছিল।

যাই হোক এখন আসল কথাটাই বলি। শিকারের উদ্দেশ্যে এঁরা দুজনে নীলপুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বহুকাল আগে যেখানে নীল এবং অত্যাচারের চাষ প্রায় সমানভাবেই

চলত, এখন সেখানে ঘোর বন-জঙ্গল এবং কতকগুলো প্রাচীন নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নেই।

সেই জন-বিরল জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে লাভের বদলে এঁরা এক ভয়ানক বিপদের মধ্যে পড়লেন। ইনি কোনক্রমে সেখান থেকে উদ্ধার পেয়ে ফিরে এলেও এঁর বন্ধুটি কিন্তু নিষ্কৃতি পেলেন না। তিনি সেখান থেকেই অতি আশ্চর্য্যভাবে অদৃশ্য হয়েছেন। ভদ্রলোক কোথায় গেলেন, তাঁর অদৃষ্টেই বা কি ঘটল তা এখনো রহস্যের অন্ধকারে। মোট কথা, সব ঘটনাটা আমি তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। অরুণবাবু আমার চেয়ে ভাল জানেন, সুতরাং ওঁর মুখ থেকেই তুমি ব্যাপারটা শোনো।"

এই কথাগুলো বলে বীরেনবাবু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অরুণবাবুর মুখের দিকে তাকালেন।

অরুণবাবু নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে বলতে সুরু করলেন :—

"সত্যি কথা বলতে কি, এই রহস্যের বিশেষ কিছু আমিও বলতে পারব না। কারণ, যা আমার কাছে অজ্ঞাত, তা বলা আমার সাধ্যের অতীত। তবে আমি যতটা জানি তা আপনাদের বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করব। আমার সেসব কথা শুনে তা অবিশ্বাস করলে বা আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলে, তাতে আমি দুঃখিত বা অবাক্

হব না। কিন্তু আমি জানি যে আমার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থই আছে এবং আমি যা বলব তাও খাঁটি সত্যি। তাকে মিথ্যে বলে হেসে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব।”

অরুণবাবুর কথাগুলো শুনে সমীর সহানুভূতির স্বরে বললে, “কিন্তু আমি একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে, জগতে এমন অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে থাকে, যাকে বাহ্য-দৃষ্টিতে অসম্ভব গাঁজাখুরী গল্প এবং মস্তিষ্কের বিকার বলে মনে হ'লেও—আপনার আমার অস্তিত্বের মতই সে-সব ব্যাপারও খাঁটি সত্যি। তবে সেকথা এখন থাক। বীরেনবাবুর কাছে যা শুনলুম তাতে মনে হচ্ছে যে, ব্যাপারটা একটু রহস্যময়। এখন আপনি যতটা জানেন, আমাদের কাছে খুলে বলুন।”

সমীরের কথায় অরুণবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, “আপনার একথা যে কতদূর সত্যি তা আমার বক্তব্যটা শুনলেই বুঝতে পারবেন। আমি যা বলব তা শুধু রহস্যময় নয়—ভীষণ অমানুষিক কাণ্ড।”

অরুণবাবু মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে বলতে সুরু করলেনঃ—

“দিন-তিনেক আগে—মানে গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে আমি আর আমার বন্ধু অজিত রায় নীলপুরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। বলে রাখা দরকার যে, একমাত্র শিকার করা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। আমাদের সঙ্গে দুটো দামী রাইফেল এবং যথেষ্ট পরিমাণ কার্ত্তুজ ছিল।

সমস্ত দিন বনে-জঙ্গলে শিকারের সন্ধানে ঘুরে আমরা ভয়ানক পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের আশায় একটা জায়গায় বসে পড়লুম। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আমরা জানতুম যে সন্ধ্যার আগেই লোকালয়ে ফিরে যেতে না পারলে আমরা বিপদে পড়ব, অন্ধকারে বনের ভেতরে পথ চিনে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসাধ্য হবে।

কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমরা এত বেশী ক্লান্ত হয়েছিলুম যে, এই আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আমরা একটু বিশ্রামের আশায় একটা পরিষ্কার জায়গায় বসে পড়লুম।

সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারে লক্ষ্য করলুম যে, আমরা যেখানে বসেছিলুম তার কিছু দূরেই একটা বহু পুরোনো গম্বুজাকৃতি কোনও জিনিষের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। গম্বুজটার ভাঙ্গাচোরা ইঁটগুলো কোনও হিংস্র পিশাচের দাঁতের মত বাইরের চুনবালির আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে রয়েছে। চারিদিকে কতকগুলো ভাঙ্গাচোরা ইঁট ছড়ানো।

সেটাকে দেখে মনে হল যে, বহু পুরোনো কোনও স্মৃতিস্তম্ভ এটা। কালের কবলে পড়ে আজ তার এই অবস্থা হয়েছে। কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, আমরা কি এক ভয়ানক জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছি!

যাই হোক, তখন আর সেই গম্বুজটার বিষয়ে গবেষণা করে সময় নষ্ট করার ইচ্ছে ছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ

গাঢ় হয়ে আসছিল। সুতরাং বেশীক্ষণ বিশ্রামের আশা ত্যাগ করে আমরা উঠে পড়লুম।

সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত গম্বুজটার প্রকৃত পরিচয় জানবার জন্যে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কিন্তু আমার বন্ধুর কৌতূহল একটু অসাধারণ রকমের। আমাকে লোকালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হতে দেখে সে একবার আগ্রহভরা দৃষ্টিতে সেই গম্বুজটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'কিছু মনে ক'র না অরুণ! তুমি ততক্ষণ এগোতে থাকো, আমি পাঁচ মিনিট পরেই ফিরব।'

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলুম, 'কারণটা বলতে তোমার বাধা নেই বোধহয় ?'

অজিত মৃদু হেসে বললে, 'কারণ শুনলে তুমি খুব খুসী হবে না নিশ্চয়ই। আমি ঐ গম্বুজটার সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করতে চাই।'

এখানে বলে রাখা দরকার যে, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের দিকে অজিতের একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। এই অদ্ভুত বাতিকটা তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছিল। কোনও ধ্বংসাবশেষের নাড়ী-নক্ষত্র না জানা অবধি তার মন স্বস্তি পেত না। কিন্তু এতে যে তার কি লাভ হত তা সেই জানে। কাজেই তাকে নিষেধ করা বৃথা জেনে আমি তাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলে আবছা-অন্ধকারে পথ চিনে লোকালয়ের দিকে এগিয়ে চললুম।

কিছুদূর গিয়েই আমি টের পেলুম যে আমি অন্ধকারে পথ ভুলে অন্য দিকে এসে পড়েছি। এই আশঙ্কা আমার মনে উদয় হতেই আমি আর না এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। কি করব ভাবছি, এমন সময়ে হঠাৎ কিছুদূরে একটা আলোর শিখা দেখে আমার মনে আশা হল যে, কাছাকাছি কোনও মানুষের সন্ধান নিশ্চয়ই মিলবে এবং তার সাহায্যে লোকালয়ে ফিরে যেতেও বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

এই আশায় আমি সেই আলো লক্ষ্য করে এগোতে লাগলুম। খানিক দূর এগিয়েই দেখতে পেলুম যে, বনের মাঝখানে খানিকটা পরিষ্কার জায়গায় একটা ছোট-খাট বাংলো রয়েছে। বাংলোটার চেহারা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সেটা ঘোর নীল রংয়ের! দেখে মনে হল যে, এটাও বহু পুরোনো কোনও নীল-চাষীদের কুঠী।

কিন্তু এই ঘোর বনের ভেতরে এই বাংলোয় বাস করে কে? কিন্তু তখন বেশী ভাববার সময় ছিল না। আবার আমি সেই বাংলোটা লক্ষ্য করে এগোতে লাগলুম।

কিন্তু আমাকে খুব বেশী দূর এগিয়ে যেতে হল না। হঠাৎ পেছন থেকে আমার বন্ধুর তীব্র আর্ত্তনাদ আমার কানে আসতেই আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

সেই আর্ত্তনাদের কারণ স্থির করবার জন্যে আমি কিছুক্ষণ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর

অজিতের বিপদের আশঙ্কার কথা মনে হতেই আমি পেছনের সেই গম্বুজটার ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করে ছুটে চললুম।

কিন্তু সেখানে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলুম না। চারিদিক ফাঁকা এবং কেমন একটা থমথমে ভাব। আমি পাগলের মত অজিতের নাম ধরে ডাকাডাকি করলুম। কিন্তু সব বৃথা হল, কেউ আমার ডাকের সাড়া দিলে না।

আমি ব্যস্ত হয়ে সেই গম্বুজটার পেছনে যেয়ে উপস্থিত হলুম। একটা কালো-রংয়ের পেঁচা আমার সাড়া পেয়ে একটা বিকট কর্কশ চীৎকার করে উড়ে পালাল। তারপর সব চুপ।

ব্যাপারটা আমার কাছে একটা ভৌতিক-রহস্য বলে বোধ হল। মনে হল, আর একটু আগেও অজিত এখানে ছিল, কিন্তু এর মধ্যে সে গেল কোথায়? সে আর্ত্তনাদ করে উঠেছিল কেন? এত ডাকাডাকি করেও তার সাড়া পেলুম না কেন? তবে কি এই গম্বুজটার সঙ্গে অজিতের আর্ত্তনাদ এবং তার নিরুদ্দেশ-রহস্যের কোনও গূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে?

আমি সেখানে আর মুহূর্ত্তমাত্র দেরী না করে আবার সেই বাংলো লক্ষ্য করে ছুটে চললুম সাহায্যের আশায়। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।”

দুই

অরুণবাবুর বক্তব্য শেষ হতেই ইন্‌স্পেক্টর বীরেনবাবু বললেন, "আমার বক্তব্যটা কিন্তু অরুণবাবুর চেয়ে একটু আলাদা রকমের—অবশ্য শুধু শেষের দিকটা। আমি যা জানি তা হচ্ছে এই যে, তার পরদিন সকালে কয়েকজন কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটতে যাবার সময়ে সেই পুরোনো গম্বুজটা থেকে কিছু দূরে অরুণবাবুকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। সেই ঘোর বনে একজন মানুষকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তারা প্রথমে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়েছিল। তারা মনে করেছিল যে, অন্যান্যবারের মত এই লোকটিও কোনও অজ্ঞাত রহস্যময়ভাবে নিহত হয়েছে। কিন্তু পরে লোকটিকে জীবিত দেখে শুশ্রূষা করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। তারপর তাদের সাহায্যেই অরুণবাবু লোকালয়ে এসে উপস্থিত হন, নইলে কি হত বলা যায় না।"

অরুণবাবু বললেন, "কিন্তু গম্বুজের কাছে আমার আসাটাই হচ্ছে অসম্ভব। কারণ, এটুকু আমার বেশ স্মরণ আছে যে, সেই গম্বুজটা থেকে আমি অন্তত আধ মাইল অবধি ছুটে গিয়েছিলুম।"

সমীর বাধা দিয়ে বললে, "যাক, সেকথা নিয়ে এখন কোন তর্ক করে লাভ নেই। আপনার কাহিনী অতি অদ্ভুত সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি বলুন !"

সমীরের কথা শুনে অরুণবাবু কাতর স্বরে বললেন, "আমি আপনাদের নাম শুনেছি বহুবার। আমার অনুরোধ এই যে, আপনারা আমার সেই নিরুদ্দিষ্ট বন্ধুকে খুঁজে বার করে দিন।

তার অদৃষ্টে কি ঘটেছে তা একমাত্র ভগবানই জানেন। তবে আমাদের সাধ্যমত তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে হবে। এবং এই রহস্যময় ব্যাপারের সমাধান করে তাকে খুঁজে বার করা একমাত্র আপনাদের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।"

সমীর মৃদু হেসে বললে, "তাড়াতাড়িতে আপনার বিশ্বাসটা একটু অপাত্রেই ন্যস্ত করেছেন অরুণবাবু! আমাদের অমানুষিক কোনও শক্তি আছে এইরকম একটা ধারণা আপনার মনে বদ্ধমূল হলে, স্বীকার করতেই হবে যে আপনি ভয়ানক ভুল করেছেন। তবে..."

বীরেনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "তবে নয় সমীর! এই ব্যাপারের তদন্তের ভার পড়েছে আমার ওপর এবং তোমাদের সাহায্যও আমার পক্ষে একান্তই দরকার। আর তাছাড়া

আমার হাতে এখন একটা ভয়ানক জরুরী কাজ রয়েছে। সুতরাং...”

হীরেন বাধা দিয়ে হেসে বললে, “সুতরাং উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে চান, এই ত? আপনার উদ্দেশ্য যে অতি সাধু এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।”

বীরেনবাবু আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন, “ওই ত তোমার দোষ হীরেন! এখানে পিণ্ডিটা কোথায় দেখলে? তা যাক্, এ নিয়ে বাজে কথার তর্ক করে কোন লাভ নেই, এখন তোমরা একটু কাজের কথা শোন। ব্যাপারটা মনে হচ্ছে আগাগোড়াই ভৌতিক। তা নইলে, নীলপুরের জঙ্গলে খুনের পর খুন হয়ে যাচ্ছে অথচ পুলিশ শত চেস্টায়ও তার কোন কিনারা করতে পারছে না, এও কি কখনো সম্ভব?”

হীরেন হেসে জিজ্ঞেস করলে, “তাহলে ভূতকে নিয়ে আর ঘাঁটাঘাটি করা কেন? আপনি দেখছি আমাদের ঘাড়ে এই ভূতুড়ে-বোঝা তুলে দেবার মতলবে আছেন। আপনার মতলবটা বড় ভাল বলে মনে হচ্ছে না।”

সমীর চুপ করে বসে নিজের মনে কিছু ভাবছিল। হঠাৎ মুখ তুলে বীরেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলে, “আচ্ছা, নীলপুরে এপর্য্যন্ত সরশুদ্ধ ক'জন লোক মারা পড়েছে এবং ক'জন নিরুদ্দেশ হয়েছে বলতে পারেন?”

বীরেনবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "এই ছ'মাসের ভেতরে তিনজন লোককে নীলপুরের জঙ্গলে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তারা যে কি করে মারা পড়ল তা অতি বিচক্ষণ ডাক্তাররাও কিছু বুঝতে পারেননি। যদিও তাদের দেহ পরীক্ষা করে মনে হয়েছিল যে তারা অতি স্বাভাবিক ভাবেই মারা গেছে, তাহলেও আমরা ডাক্তারদের এই মত অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিতে পারিনি।"

সমীর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলে, "কারণ?"

বীরেনবাবু বললেন, "তোমার এই ছোট্ট প্রশ্নটুকুর উত্তর দিতে পারলে অনেক-কিছুই জানা যেত সমীর! তবে এটুকু বলতে পারি যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেই আমাদের মনে একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হয়েছে। প্রথমত, যারা মারা গেছে বা নিরুদ্দেশ হয়েছে, তারা সকলেই প্রায় সুস্থ সবল-দেহ যুবক। তিন-তিনজন বলবান্ যুবক কয়েক মাসের ভেতরে পর-পর মারা পড়ল এবং বাকি কয়েকজন শূন্যে অদৃশ্য হ'ল কি করে বলতে পার তুমি? আর যারা মারা পড়েছে, তাদের সবার দেহই পাওয়া গেছে ঘোর জঙ্গলের ভেতরে। এই সব ব্যাপার দেখে-শুনেই আমাদের ধারণা হয়েছে যে, এর ভেতরে কোনও অলৌকিক-রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে। আর যারা নিরুদ্দেশ হয়েছে, তারাই বা গেল কোথায়?"

সমীর গম্ভীরভাবে বললে, "বেশ! এই ব্যাপারে আমি অরুণবাবুকে সাহায্য করতে রাজি আছি। কিন্তু এক সর্ত্তে—আপনিও আমাদের দলে থাকবেন।"

বীরেনবাবু উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই! তবে দুদিন দেরী হবে। এখানকার কাজ শেষ করে আমিও যে নীলপুরে গিয়ে তোমাদের দলে যোগ দেব এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

সমীর হেসে বললে, "তথাস্তু! আমরা তাহলে আজকেই নীলপুরের দিকে রওনা হব। আপনি তৈরি থাকবেন অরুণবাবু!"

তিন

নীলপুরে পৌঁছে সমীরের কথামত তারা তিনজন জঙ্গলের ভেতরে সেই পুরোনো নীল রংয়ের বাংলোটায় এসে আশ্রয় নিলে। কাছাকাছি চারিদিকে অন্য কোনও বসতি বা জন-মানবের চিহ্নমাত্র নেই। লোকালয় এখান থেকে প্রায় ক্রোশ-খানেক দূরে। বাংলোটার চারপাশে খানিকটা জায়গা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তারপরেই আরম্ভ হয়েছে বন-জঙ্গল।

বাংলোটা বহুকালের পুরোনো হলেও একেবারে অব্যবহার্য্য নয়। বহুকাল আগে এই বাংলোয় কে বাস করত কে জানে! তবে এটা যে কোনো অজ্ঞাত নীল-চাষীদের বাসস্থান ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বাংলোটার সামনেই একটা ক্ষয়প্রাপ্ত শ্বেত-পাথরে অস্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে—'ব্লু-হাউস'।

বাংলোটার ভেতরে ঢুকে সবচেয়ে বিস্মিত হলেন অরুণবাবু। কয়েকদিন আগেই তিনি এই বাংলোয় আলো দেখতে পেয়েছিলেন। মানুষ ছাড়া এই বাংলোর ভেতরে আলো জ্বালবে কে? সুতরাং কয়েকদিন আগেও এখানে কেউ বাস করত। কিন্তু কে সে? এখন দেখে-শুনে ধারণা হয় যে,

কয়েক বছরের মধ্যেও এখানে কেউ বাস করেনি! তবে কি ব্যাপারটা বাস্তবিকই কোনও ভৌতিক-রহস্য ?

হীরেন অরুণবাবুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, "আপনি সেদিন ভুল দেখেন নি ত অরুণবাবু ?"

অরুণবাবু চারিদিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, "অসম্ভব! আমি যা দেখেছি তা চোখের ভুল হতে পারে না। কেউ যে এখানে তিনদিন আগেও বাস করত, এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

সমীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিক দেখছিল। সে বললে, "সে কথার আলোচনা এখন মুলতুবী থাক হীরেন! আগে চল সেই পুরোনো গম্বুজটা দেখে আসি, যেখান থেকে অরুণবাবুর বন্ধু অদৃশ্য হয়েছেন।"

'ব্লু-হাউস' থেকে গম্বুজটার দূরত্ব প্রায় আধমাইল হবে। ব্লু-হাউসের সামনের দিকে বনের ভেতরে সেই গম্বুজটার ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত।

সমীর ও হীরেন তাদের জিনিষপত্র বাংলোতে গুছিয়ে রেখে অরুণবাবুর সঙ্গে সেই গম্বুজটার সন্ধানে বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল।

গম্বুজটার সামনে গিয়ে সমীর দেখতে পেলে যে, অরুণবাবুর কথা বিন্দুমাত্র মিথ্যা নয়। সেটা বহুকালের পুরোনোই বটে। সে কিছুক্ষণ গম্বুজটাকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলে।

তার গঠন-প্রণালী দেখে তার মনে একটা সন্দেহের উদয় হতেই সে সেটাকে ভাল করে পরীক্ষা করবার জন্যে সেই দিকে ঝুঁকে পড়ল।

একটু নীচু হতেই সে দেখতে পেলে যে, গম্বুজটার একধারে ভাঙ্গাচোরা একটা পাথরের ওপরে অস্পষ্ট ভাষায় কিছু লেখা রয়েছে। সমীর অতি কষ্টে সেই লেখাটা পড়তে সমর্থ হল। তাতে লেখা রয়েছে—কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডো।

মৃত্যু,—২-৩

মৃত্যুর তারিখটা দুটো অঙ্ক ছাড়া আর কিছুই পড়া গেল না। পাথরটা ভেঙ্গে-চুরে যাওয়াতে বাকি অঙ্ক দু'টো অদৃশ্য হয়েছে।

এই কয়েকটা কথা ছাড়া সেখানে আর কিছুই লেখা নেই। লেখাগুলো পড়ে সমীরের বুঝতে বাকি রইল না যে, এটা বহু পূর্ব্বে মৃত পর্ত্তুগীজদেশীয় কুখ্যাত একজন কাউণ্টের নাম।

সে কাউণ্টের এই নামটা পড়েই চমকে উঠল। 'কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডো!' যে দুর্দ্ধর্ষ কাউণ্ট একাধারে জলদস্যু এবং নীল-চাষী দুই-ই ছিল, তাঁর সমাধি রয়েছে নীলপুরের এই ঘোর জঙ্গলে? এ যে বিশ্বাসেরও অযোগ্য!

হীরেনের দিকে তাকিয়ে সমীর জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডোর নাম কখনো শুনেছ হীরেন?"

হীরেন একটু ভেবে বললে, "হাঁ! আমার স্মৃতি-শক্তি যদি নষ্ট না হয়ে থাকে, তবে স্বীকার করব যে এই নাম আমার

অপরিচিত নয়! বহু বছর আগেকার ভীষণ দুর্দান্ত এবং অসীম অত্যাচারী এই কাউন্ট ফার্ণাণ্ডো ছিল পর্ত্তুগীজদেশীয় লোক। এদেশের নীল-চাষে সে যে কুখ্যাতি অর্জ্জন করেছিল, নীল-চাষের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। নীলের চাষ এবং সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি এই দুই ব্যবসাই তার নামের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত।”

সমীর অন্যমনস্কভাবে বললে, “হ্যাঁ! সে নীল-চাষী হলেও এটা ছিল তার ছদ্মবেশ। সেদিন অরুণবাবু এবং তাঁর বন্ধু বিশ্রামের জন্যে যে-গম্বুজটার ধারে এসে বসেছিলেন সেটা আসলে একটা সমাধি-স্তম্ভ মাত্র। এবং সেই সমাধি আর কারও নয়—কুখ্যাত জলদস্যু এবং নীল-চাষী সেই কাউন্ট ফার্ণাণ্ডোর। ঐ পাথরের ফলকেই তুমি এই গম্বুজটার প্রকৃত পরিচয় দেখতে পাবে, আর এই সমাধির ধার থেকেই অজিতবাবু অদৃশ্য হয়েছেন। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত বলে মনে হয় না কি?”

সমীরের কথা শুনে অরুণবাবু ভীত-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বললেন, “তাহলে কি…”

সমীর বাধা দিয়ে বললে, “কোনও কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে বিপথে চালিত হবেন না অরুণবাবু! আপনার মনের এই অন্ধ-কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলুন। জীবিত অবস্থায় কাউণ্ট যত বড় পাষণ্ড এবং অত্যাচারীই থাক না কেন, মৃত অবস্থায় অন্য সবার

মত তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মানুষের ক্ষতি করা এখন তার ক্ষমতার বাইরে। সে যাই হোক, এখন চলুন, ব্লু-হাউসে ফেরা যাক। এদিকে সন্ধ্যা হবারও আর খুব বেশী দেরী নেই। সন্ধ্যার আগেই আমাদের ব্লু-হাউসে ফিরতে হবে।”

চার

ব্লু-হাউসে ফিরে এসে সমীর বললে, "চল হীরেন! বাংলোটার ঘরগুলো সব একবার ঘুরে দেখা যাক্। কারণ, ঐ সমাধির তলায় যে মহাত্মা শুয়ে আছেন, সেই কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডোর সঙ্গে এই ব্লু-হাউসের নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ ছিল। বোধহয়, বহু-কাল আগে এই ব্লু-হাউসই ছিল কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডোর বাসস্থান। এই বাংলোটার নাম থেকেও অনেকটা এইরকমই বোধ হয়। সুতরাং, সবার আগে এই ব্লু-হাউসটাই একবার ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার।"

বাংলোটার নীচে চারখানা এবং ওপরে ছোট একখানা ঘর। তবে দরজা-জানলা সব বন্ধ।

সমীর আর হীরেন অনেক কষ্টে সেই ঘরের দরজা খুলে ফেললে। বাইরে থেকে দেখা গেল, ঘরের ভেতর ঘন অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে।

হীরেন দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় সমীর তার হাত ধরে বাধা দিয়ে বললে, "হঠাৎ ঘরের ভেতরে ঢুকো না হীরেন! এই ঘরটা অনেকদিন বন্ধ ছিল। ঘরে বিষাক্ত বাষ্পের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। দুমিনিট অপেক্ষা কর।"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সমীর সেই ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলে—পেছনে হীরেন আর অরুণবাবু।

সমীর একবার সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক পরীক্ষা করে বললে, "ব্যাপারটা অসাধারণ বটে। বহুকাল এই ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে এর চেহারা হত অন্যরকম। না, না, এটা বহুদিন এভাবে মোটেই বন্ধ ছিল না। কয়েকদিন আগেও এই ঘরে কেউ ছিল এবং ঘরের দরজা-জানলাও কিছু বন্ধ ছিল না।"

হীরেন প্রতিবাদের স্বরে বললে, "বনের ভেতরে এই পরিত্যক্ত পোড়ো-বাংলোতে কে বাস করতে আসবে? তাছাড়া এটা লোকালয় থেকেও বহু দূরে এবং এ-অঞ্চলে এই বাংলোটার অখ্যাতির কথাটাও ভুললে চলবে না। এসব কথা ভেবে দেখেছ কি?"

সমীর ঘরের ভেতরে পায়চারী করতে করতে বললে, "নিশ্চয়ই! কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে লোকে অনেক সময়ে অনেক কিছুই বলে থাকে। বিনা প্রমাণে আমাদেরও কি তাই সত্যি বলে মেনে নিতে হবে নাকি?"

হীরেন একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলে, "দিন-তিনেক আগে এই ঘর খোলা ছিল একথা তুমি আবিষ্কার করলে কি করে?"

সমীর মৃদু হেসে বললে, "তার প্রমাণ আমাদের চোখের

সামনেই রয়েছে। তোমার দৃষ্টিশক্তি নেহাৎ সামান্য বলেই তুমি তা দেখতে পাওনি। একটু লক্ষ্য করলেই তুমি দেখতে পাবে যে, এই ঘরের দরজা-জানলাগুলো ছাড়া অন্য সমস্ত অংশটুকুই মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন। অথচ দরজা-জানলাগুলোর কোথাও মাকড়সার জালের চিহ্নমাত্র নেই, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই রয়েছে। এই থেকে প্রমাণ হয় দুটো জিনিষ। প্রথমতঃ—এই ঘরের জানলা-দরজাগুলো খোলা ছিল অথবা প্রায় খোলা হত। দ্বিতীয়তঃ—এখানে যে বাস করত সে ইচ্ছে করত না যে কেউ এখানে এসে তার বসবাস করবার কোনও চিহ্ন খুঁজে পায়। তাই ঘরের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সে উদাসীন ছিল।”

সমীরের দৃষ্টি দেয়ালের একটা জায়গায় পড়তেই সে থমকে দাঁড়াল। সে লক্ষ্য করে দেখতে পেলে যে, দেয়ালের এক জায়গায় মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন একটা বড় ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। হঠাৎ দেখলে সেটার দিকে কারও নজর পড়ে না।

সমীর মাকড়সার জাল পরিষ্কার করে দেখতে পেলে, সেটা কোনও বিদেশী পুরুষের একটা অয়েল-পেন্টিং ছবি। সেই ছবিটার ঠিক নীচেই লেখা রয়েছে, ‘কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডো’।

ছবিটা বহুদিনের পুরোনো হলেও এমন চমৎকার অবস্থায় ছিল যে দেখলে সেটা কারও জীবন্ত মূর্ত্তি বলেই ভ্রম হয়। ছবিটার চোখে-মুখে ভীষণ একটা পৈশাচিক ভাব ফুটে উঠেছে।

যে-কেউ দেখে বলে দিতে পারে যে, ছবিটা যার সে মানুষ হলেও নরদেহধারী হিংস্র শয়তান ছাড়া আর কিছু নয়।

সমীর নিজের মনেই বলে চলল, "কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডো··· চেহারা দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে এই কাউণ্টের নামে যেসব প্রবাদ এবং অখ্যাতি প্রচলিত আছে সেসব একেবারে মিথ্যে নয়। যাক্, আমার অনুমান তাহলে ভুল নয়। এই ব্লু-হাউসই যে কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডোর বাসস্থান ছিল, তা স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে।"

হীরেন জিজ্ঞেস করলে, "তাহ'লে এখন কিভাবে এগোতে চাও তুমি? কিন্তু একটা কথা মনে রেখো যে, এপর্য্যন্ত যত লোক নিরুদ্দেশ হয়েছে বা মারা পড়েছে, সে সব কাণ্ডই এই ব্লু-হাউস থেকে দু'এক মাইলের ভেতরে ঘটেছে। সুতরাং কাউণ্টের এই অভিশপ্ত বাংলোতে বেশীদিন বাস করাটা আমি মোটেই নিরাপদ বলে মনে করি না। রহস্যের সমাধান করতে এসে শেষে আমরাই না আবার এই রহস্যের খোরাক হয়ে বসি।"

সমীর বললে, "আশ্চর্য্য! তুমিও কি এইসব ঘটনা আজগুবি ভৌতিক বলে বিশ্বাস কর নাকি? লোকে যা বলে বলুক ক্ষতি নেই, কিন্তু তুমিও কি মনে কর যে কাউণ্টের আত্মা তার সমাধিস্থান থেকে উঠে এসে এইসব কাজ করে বেড়াচ্ছে?"

হীরেন বললে, "এছাড়া আর কি মনে করা যায় বল? অরুণবাবু সেদিন এই বাংলোতেই আলো দেখতে পেয়েছিলেন।

তুমিও বলছ, কয়েকদিন আগেও এই ওপরের ঘরে নিশ্চয়ই কেউ ছিল, আর ঘরের দরজা-জানলাও তখন বন্ধ ছিল না। কিন্তু আজ আমরা এখানে এসে দেখছি, দরজা-জানলা বন্ধ, আর মানুষ বাস করা ত দূরের কথা, একটা চাম্‌চিকে বা ইঁদুরও এখানে বাস করে না!"

সমীর বললে, "তাহ'লে তোমারও ধারণা, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভৌতিক···সম্ভবত কাউণ্টের প্রেতাত্মাই সেজন্যে দায়ী···কেমন, তাই নয়? তা ছাড়া আর কি কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় বল?"

সমীর বিরক্তির সঙ্গে বললে, "লেখাপড়া শিখে তুমি যে এত বড় একটা গো-মূর্খ হয়েছ, এটা আমি ভাবতে পারিনি হীরেন! যে মানুষটা মরে ভূত হয়েছে কবে, তাকে তোমার এখনো এত ভয়?"

হীরেন বললে, "তুমি একটা প্রকাণ্ড ভুল করছ সমীর! আমি ত কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডোর কথা বলছি না, আমি বলছি তার আত্মার সম্পর্কে। মনে রেখো, মানুষের চেয়ে মানুষের আত্মাকেই বেশী ভয় করতে হয়। কারণ, মানুষ বেঁচে থাকতে যত না ক্ষমতাশালী থাকে, মৃত্যুর পরে তার আত্মার দৌলতে সে তার চেয়ে শত-সহস্রগুণ বেশী ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে।"

সমীর বললে, "তোমার মাথা! আমার প্রার্থনা হচ্ছে—তুমি তাহ'লে মর এখুনি। মরে তুমি অসীম ক্ষমতা লাভ করে এই ব্যাপারটার মীমাংসা কর।"

অরুণবাবু মৃদু হেসে বললেন, "আপনারা দেখছি বেশ একটু তীব্র রসিকতার সৃষ্টি করে তুললেন! আসল কথা হচ্ছে কি সমীরবাবু, আপনার প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব ও দুর্জ্জয় মনোবলের কাছে বিজ্ঞান ছাড়া আর কোন-কিছুই আমল পায় না। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ লোক, যত লেখাপড়াই শিখি না কেন, তবু আমরা অদ্ভুত কিছু দেখলেই যেন অলৌকিক ও ভৌতিক বলে মনে করে বসি! সবাই যদি আপনার মত···"

বাধা দিয়ে সমীর বললে, "এখন সে-কথা থাক অরুণবাবু! শুনুন, এখন আমার কথা শুনুন। রাত হয়ে এসেছে। এখন তাড়াতাড়ি একটু কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া যাক্। আজকের রাতটা কেটে যাক্, তারপর কাল দিনের বেলায় কাজের একটা প্ল্যান্ তৈরি করে সেই অনুসারে কাজ সুরু করা যাবে। এই ওপরের ঘরটাই বোধহয় আপনাদের কাছে বেশী ভৌতিক বলে মনে হয়; কাজেই এ-ঘরে আপনাদের কাউকে শুতে হবে না, এ-ঘরে শোব আমি। আর নীচের যে-কোন ঘর বেছে নিয়ে আপনারা দু'জন শোবেন। ঘরে সারা রাত আলো জ্বেলে রাখুন আপত্তি নেই, আর হীরেনের কাছে ত একটা রিভলভার রয়েছেই। কাজেই, আপনাদের ভয়ের কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। ওপরে আমার কাছেও একটা রিভলভার থাকবে। দু'দুটো রিভলভার আমাদের কাছে থাক্তেও কাউণ্টের প্রেতাত্মা যদি একটা কিছু করে যেতে পারে, তাহলে অবশ্য আমি নাচার!"

হীরেন বললে, "বর্মাতে থাকলে সে অভিজ্ঞতাও তোমার হবে, এ আমি ঠিক বলতে পারি।"

"বেশ—বেশ। একটা কিছু অভিজ্ঞতারই আশায় ত এসেছি হীরেন! এত কষ্ট স্বীকার করেও যদি কোন অভিজ্ঞতাই না হয়, তাহ'লে আর এই রহস্যের সমাধান হবে কেমন করে, বল?"

মৃদুহেসে এই কথা বলে, সমীর তখনই আবার বললে, "এখন সেকথা বন্ধ থাক হীরেন! এখন খাবার কি আছে বার কর। ক্ষিদেয় পেটের নাড়ীভুঁড়ি দাউ-দাউ করে জ্বলছে। সেই আগুনটা এখন নেভাও ত!"

"আচ্ছা" বলে হীরেন তার টিফিন্-কেরিয়ার থেকে খাবার বার করতে ব্যস্ত হ'ল।

পাঁচ

গভীর নিস্তব্ধ রাত। প্রায় আড়াইটের সময় নীচের তলায় হঠাৎ ভয়ানক আর্ত্তনাদ জেগে উঠল।

অরুণবাবুর ভীতকণ্ঠের আর্ত্তনাদে সমীর ধড়্‌মড়্‌ করে বিছানার ওপর উঠে বসল। তারপর তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে বাইরে নীচে ছুটে গেল। ঘরে ঢুকেই সে দেখতে পেলে, বিছানার ওপর হীরেন অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছে আর অরুণবাবু তাঁর বিছানায় শুয়ে কাত্‌রাচ্ছেন। তাঁর গলার ডানপাশ থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে।

সমীর ভীত-বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আপনার কি হয়েছে অরুণবাবু? গলা থেকে ওরকম রক্ত পড়ছে কেন?"

অরুণবাবু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "আর এক মুহূর্ত্তও আমি এই ব্লু-হাউসে থাকতে রাজি নই সমীরবাবু। আমি কাল রাত্রে স্বচক্ষে কাউণ্টকে দেখেছি এবং আমার এই অবস্থার জন্য সেই দায়ী।"

মুহূর্ত্তের জন্যে সমীর হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর সেভাব দমন করে বললে, "কি আবোল-তাবোল বকছেন অরুণবাবু!

কি হয়েছে সব কথা আমায় ভাল করে খুলে বলুন। কাল রাত্রে আপনি কাউণ্টের দেখা পেয়েছিলেন একথার মানে কি? আপনার এই অবস্থাই বা হল কি করে -আর হীরেনই বা এমন অচৈতন্য কেন?”

অরুণবাবু ধীরে ধীরে যা বললেন তা হচ্ছে এই যে, গত রাত্রে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হওয়াতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভাঙ্গতেই তাঁর মনে হল কেউ যেন তাঁর বুকের উপর চেপে বসে আছে। একথা মনে হতেই তাঁর প্রাণে দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হল। ভাল করে তাকিয়ে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর বুকের ওপর একটা কুৎসিত লোক বসে রয়েছে···তার হাতে একটা ছোট যন্ত্র, তাতে একটা রবারের নল লাগানো। অরুণবাবুর মনে হল, লোকটা যেন পাম্প্ করে তার দেহ থেকে রক্ত বার করে নিচ্ছে।

তাঁর গলার পাশ দিয়ে খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল তাও তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝলেন, এই রক্তশোষক লোকটির সাধু উদ্দেশ্যে বাধা দিতে না পারলে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত। কাজেই, শরীরের সমস্ত দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেলে তিনি এক ঝটকায় তাকে বুকের ওপর থেকে মাটিতে ফেলে দিলেন।

তারপর মাটিতে পড়ে সেই কুৎসিত লোকটির হাতের যন্ত্রটা ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যায় আর যে-পাত্রে রক্তটা সংগ্রহ করা

হয়েছিল সেটিও ভেঙ্গে গেছে। কাজেই তাঁর দেহে ও ঘরে এত রক্ত।

হীরেনের কথা জিজ্ঞেস করায় অরুণবাবু বললেন, "সেই কুৎসিতমুখো লোকটা যখন পাম্প্ করে আমার গলা থেকে রক্ত বার করে নিচ্ছিল, তখন কোনরকমে একবার মাত্র আমি হীরেনবাবুর দিকে একটু তাকিয়েছিলুম।

সেই একমুহূর্ত্ত সময়ে আমি দেখেছিলুম, একটা দীর্ঘদেহ লোক তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মোটর-সাইকেলের হর্ণের মত কি একটা রবারের বল অনবরত টিপছে। আমার মনে হল, তারই ফলে হীরেনবাবু অত বেঘোরে ঘুমুচ্ছেন! নইলে আমার এই বিপদের সময় তিনি কখনো চুপ করে থাকতে পারতেন না—তাঁর রিভলভার গর্জ্জে উঠত নিশ্চয়।

কিন্তু এর মাঝে সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, লোকটা আর কেউ নয়,—লোকটা হচ্ছে স্বয়ং কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডো বা তার কোন প্রেতাত্মা!"

অরুণবাবু আবার বললেন, "লোকটাকে দেখে আমার বুকের রক্ত জমে বরফ হয়ে গেল। ভাবলুম, এযাত্রা আর কোনমতে নিস্তার নেই। কারণ, বহু বছর আগে মৃত দুর্দ্দান্ত জলদস্যু কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডো আমাদের ধ্বংসের জন্যে উদয় হয়েছে! ওপরের ঘরে কাউণ্টের যে ছবিটা রয়েছে, হুবহু ঠিক সেইরকম দেখতে তাকে। ভয়ে কোনরকমে একবার চেঁচিয়ে উঠেছিলুম শুধু

এইটুকুই মনে আছে। তারপরে যে কি ঘটেছিল তা আর বলতে পারবো না। এখন দেখছি আমি আমার বিছানাতেই শুয়ে আছি।"

সমীর তাচ্ছিল্যভরে বললে, "আপনি দুঃস্বপ্নকে বাস্তব বলে ভুল করেছেন অরুণবাবু। সে যাহোক, এখন তাড়াতাড়ি হীরেনকে সুস্থ করা দরকার।"

এরপর উভয়ের সমবেত চেষ্টায় আধঘণ্টার ভেতরেই হীরেনের চৈতন্য ফিরে এলো। আরো ঘণ্টাখানেক সেবা-শুশ্রূষা ও বিশ্রামের পর হীরেন বেশ সুস্থ হয়ে উঠল। সেও তখন তাদের সঙ্গে রাতের ঘটনার আলোচনায় যোগদান করলে।

একটা কথা মনে হতেই হীরেন একটু আশার আলো দেখতে পেলে। সে আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলে, "কাল রাত্রে প্রথম দিকে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, না অরুণবাবু?"

অরুণবাবু বিষণ্ণভাবে বললেন, "হ্যাঁ! কিন্তু এখন সেকথা নিয়ে আলোচনা করবার কত মনের অবস্থা আমার নেই।"

হীরেন উৎসাহভরে বললে, "আমার কথাটা নেহাৎ বাজে মনে করবেন না অরুণবাবু। এই বৃষ্টির সাহায্যেই আমি একটু গোয়েন্দাগিরি করব। এবং কাল রাত্রে কে আমাদের ঘরে প্রবেশ করেছিল তার কিছু সন্ধানও হয়ত পেতে পারি।"

অরুণবাবু অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, "কি রকম?"

হীরেন বললে, "আমার কিছু বলবার দরকার হবে না।

আমার সঙ্গে আসুন, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন। সমীর, তুমিও এসো।"

অরুণবাবুর ঘরে পৌঁছে মেজেতে খুব মনোযোগ দিয়ে হীরেনকে কিছু অন্বেষণ করতে দেখে অরুণবাবু তার মতলব বুঝতে পেরে বললেন, "আপনি কি পায়ের ছাপ ধরে এই রহস্যের মীমাংসা করতে চান নাকি ?"

হীরেন গম্ভীরভাবে বললে, "হ্যাঁ ! কতকটা তাই বটে। তবে এত সহজে যে এই রহস্যের মীমাংসা হবে একথা মনেও আনবেন না। পায়ের ছাপ অনুসরণ করলেই যে কালকের নৈশ-অতিথির সন্ধান পাব একথা ধারণায় আনাও মূর্খতা মাত্র। আমি শুধু এই পায়ের ছাপ অনুসরণ করে দেখতে চাই যে, কাল রাত্রে যে ব্লু-হাউসে এসেছিল, সে এই বাংলোর কোন্‌-দিক থেকে এখানে এসেছিল। কাল রাত্রে কোনও মানুষ এই বাংলোতে এসে থাকলে, ফিরে যাবার সময়ে সে তার পায়ের ছাপ জলে-ভেজা মাটির ওপর রেখে গেছে নিশ্চয়ই।"

ব্লু-হাউসের বাইরে এসে হীরেন দেখতে পেলে, এক-জোড়া পায়ের ছাপ—যেদিকে কাউণ্টের সমাধি-স্তম্ভটা রয়েছে ঠিক সেইদিক থেকেই বাংলোর দিকে এসেছে।

সেই অজ্ঞাত আগন্তুকের পায়ের ছাপগুলো এইবার সমীরকেও যেন ভাবিয়ে তুললে। সে ভাবতে লাগল—তাহলে অরুণবাবু যা বলেছেন তা কি সম্পূর্ণ সত্যি ! কাল রাত্রে কি

মৃত কাউন্ট ফার্ণাণ্ডোই এই বাংলোতে এসে উপস্থিত হয়েছিল ? কিন্তু একথা যে পাগলেরও বিশ্বাসের অযোগ্য। বহু বছর আগে মৃত ব্যক্তির দেহ তার সমাধি থেকে জীবিত হয়ে উঠে আসবে কি করে ? তার সঙ্গে যে কুৎসিত-মুখো লোকটা আবির্ভাব হয়েছিল, সেটাই বা কে ? আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কেউ যে ব্লু-হাউসে এসেছিল তার পদচিহ্ন রেখেই সে তা প্রমাণ করে গেছে। কিন্তু ফিরে যাবার কোন চিহ্ন নেই। তাহলে কি সে এখনও এই ব্লু-হাউসেই আছে ? কে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে ?

অরুণবাবু এবার আতঙ্কের স্বরে বললেন, "আমার কথা যে অলীক স্বপ্নমাত্র নয়, তার প্রমাণ পেলেন ত সমীরবাবু ? আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে যেখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি সেটা জলদস্যু কাউন্ট ফার্ণাণ্ডোর অভিশপ্ত বাংলো। এখানে আর একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।"

অরুণবাবুর কথা শুনে সমীর তার মনের ভাব সংযত করে বললে, "বাইরে থেকে সব-কিছু বিচার করলে অনেক সময়ে ঠকতে হয় অরুণবাবু! এই পায়ের ছাপ কার, কাল রাত্রে কে গোপনে ব্লু-হাউসে এসেছিল, আর আপনি যাকে দেখেছিলেন প্রকৃতপক্ষে সে কে, এইসব ব্যাপারের সন্ধান করতে হলে আমাদের মাথা ঠিক রেখে কাজ করতে হবে। অস্বাভাবিক একটা কিছু দেখে বাইরে থেকে তার বিচার করে

পিছুপাও হলে সব দিক পণ্ড হবে। তাছাড়া যেজন্যে আমাদের এখানে আসা, আপনার সেই বন্ধুরও কোনো সন্ধান হবে না।"

অরুণবাবু ব্যাকুল স্বরে বললেন, "কিন্তু এই ভূতুড়ে-বাংলোতে বাস ক'রে, অজ্ঞাত-বিপদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের ক্ষতি ছাড়া লাভ কি হবে? অজিতের সন্ধান ত এই ভূতুড়ে-বাংলোতে বাস না করেও হতে পারে।"

সমীর ধীরে ধীরে বললে, "এখান থেকে দু' মাইল দূরে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়ে আপনার বন্ধুর সন্ধান করা অসম্ভব বলেই আমি মনে করি। ভূতুড়ে-বাংলোর এই রহস্য এবং বিপদের সঙ্গে বাস করেই আপনার বন্ধুর সন্ধান করতে হবে। তাছাড়া, আমরা যখন কিছুদূর এগিয়ে পড়েছি তখন আর এই বাংলো ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া চলে না। বিশেষত, আজকে এখুনি আমি কলকাতায় চলে যাচ্ছি। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আপনাদের এখানেই থাক্‌তে হবে।"

হীরেন বললে, "কল্‌কাতায় যাচ্ছ এখুনি, এর মানে?"

সমীর বললে, "এই ব্যাপারের সম্পর্কেই আমার যাওয়া প্রয়োজন। যাই হোক্‌, সাবধানে থেকো, ভয় পেয়ো না, নীচেই দু'জনে দু'ঘরে শোবে—এই হচ্ছে আমার উপদেশ।"

ছয়

গভীর রাত্রে একটা কিছুর শব্দে হীরেনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে পেলে, ঘর আবছা অন্ধকারময়। ঘর অন্ধকার দেখে সে প্রথমে একটু চমকে উঠল, পরক্ষণেই তার মনে পড়ল যে সে নিজেই শোবার আগে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল। জানলা দিয়ে সামান্য একটুকরো চাঁদের আলো ঘরের ভেতর এসে পড়েছিল। সেই আলোতে ঘরের সব-কিছুই আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছিল।

হীরেন বিছানায় শুয়ে-শুয়েই ভাববার চেষ্টা করলে হঠাৎ কিসের শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিন্তু অনেক ভেবেও সে কিছু ঠিক করতে পারলে না।

কিন্তু হীরেনকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। হঠাৎ দরজার বাইরে একটা মৃদু অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। সেই পায়ের আওয়াজ শুনে গতরাত্রের কথা তার মনে পড়ল। সে চুপ করে বিছানায় শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল এর পর কি ঘটে তা দেখবার জন্যে।

ধীরে ধীরে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। দরজাটা হীরেন শোবার আগে ভাল করেই বন্ধ করে দিয়েছিল। সুতরাং এখন

দরজাটা বেমালুম খুলে যেতে দেখে সে স্তম্ভিতভাবে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। সে কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না, অথচ ঘরের দরজা খুলল কি ক'রে! তাহলে কি এসব সত্যিই কোনো ভৌতিক-রহস্য! হীরেন এর বেশী আর কিছু ভাববার অবসর পেলে না। তারপরেই সেই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল একটা বিশাল মানুষের মূর্ত্তি।

ঘরে ঢুকেই মূর্ত্তিটা ধীর পদক্ষেপে জানলার দিকে অগ্রসর হ'ল। চাঁদের আলোতে তার মুখ দেখে হীরেন আতঙ্কে বিছানায় শুয়ে-শুয়েও ঘামতে লাগল। গভীর রাত্রে তার ঘরে যে-মূর্ত্তিটার আগমন হয়েছে সে বহুকাল পূর্ব্বে মৃত স্বয়ং কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডো ছাড়া আর কেউ নয়! সে ওপরের ঘরে যে ছবিটা দেখেছে সেটা যে এই মূর্ত্তিটারই ছবি এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

তার মনে হ'ল, অরুণবাবু ত' তাহলে ঠিক কথাই বলেছেন। এ যে সত্যিই অভিশপ্ত বাংলো!

কাউণ্টের মূর্ত্তি কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে হীরেনের বিছানার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

হীরেন তার হাতের রিভলভারটা তুলে কাউণ্টকে লক্ষ্য করলে। ভয়ে, উত্তেজনায় তার হাত তখন থরথর করে কাঁপছিল। পরক্ষণেই হীরেনের হাতের রিভলভারটা গর্জ্জন করে উঠল।

হীরেন কাউণ্টকে লক্ষ্য ক'রে গুলী করতেই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল। গুলীর আঘাতে কাউণ্ট আহত হওয়া ত' দূরের কথা, একটা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ক'রে তখুনি পেছনে হটে এলো।

সমীর বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলে, তার চোখের সামনে থেকেই কাউণ্টের মূর্ত্তি দরজা দিয়ে না বেরিয়ে অতি অদ্ভুত ভাবে ঘরেই যেন কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে! মূর্ত্তিটা মিলিয়ে যেতে সামান্য বাকি···আর শুধু গলা ও মাথাটুকু দেখা যায়···হীরেনের রিভল্‌ভার এম্‌নি সময়ে আর-একবার গর্জ্জন করে উঠল মূর্ত্তিটার মাথা লক্ষ্য ক'রে।

তবু—আশ্চর্য্য! মূর্ত্তিটা একবার শুধু কেঁপে উঠল, পরক্ষণেই সেটি আবার সেইরকম আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল।

হীরেন এবার ভয়ে রীতিমত ঘেমে উঠল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আর এক অভাবনীয় ব্যাপার! প্রচণ্ড বেগে একখণ্ড পাথর বাইরে থেকে ছুটে এসে সবেগে মূর্ত্তিটার মাথায় আঘাত করলে।

মূর্ত্তিটা এবারে যেন মুষ্‌ড়ে গেল। পাথরের আঘাতে ধড় থেকে মুণ্ডুটা ছিন্ন হয়ে বেমালুম খুলে এলো আর সেই সঙ্গে চোখের পলকে মুণ্ডুহীন ধড়টা ভৌতিক-দেহের মত কোন্ রহস্যের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মূর্ত্তিটা মিলিয়ে যাবার পর হীরেনের মনে পড়ল অরুণবাবুর

কথা। সমীরের উপদেশমত তারা দু'জনে নীচের দু'খানা ঘরেই শুয়েছিল। তার ভাগ্যে যা ঘটবার তা ত' ঘটলই, এখন অরুণবাবুর অবস্থাটা জানবার জন্যে কাঁপতে-কাঁপতেই সে ও-পাশের ঘরের বন্ধ-দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল, "বলি, ও মশাই? ও অরুণবাবু? আরে, আপনি কুম্ভকর্ণকেও যে হার মানালেন দেখছি। যদি বেঁচে থাকেন ত' জেগে উঠুন, জেগে থাকেন ত' শীগ্‌গির উঠে দরজার খিল খুলে দিন। বাইরে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল, আর ঘরের মধ্যে শুয়ে-শুয়ে আপনি দিব্যি আরামে নাক ডাকাচ্ছেন? শীগ্‌গির বাইরে বেরিয়ে আসুন। আর ভূতের ভয় নেই। আমাদের এক বন্ধু-ভূত আমাদের শত্রু-ভূতের ঘাড় মট্‌কে বধ ক'রে আমাদের কিভাবে নিষ্কণ্টক করেছে, বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে যান।"

কথাগুলো বলে হীরেন একটু চুপ ক'রে থেকে ঘরের ভেতর থেকে কোনও জবাব আসে কিনা শোনবার জন্যে কান খাড়া করে রইল। ঘরের ভেতর থেকে একটা গোঙানির শব্দ আসছে না? হ্যাঁ, তাইত! এতো অরুণবাবুরই গলার স্বর, "য়্যাঁ, ওরে বাবা! ভূত? ভূতের ঘাড় মট্‌কেছে ভূতে? আর সেই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেও আপনি বেঁচে আছেন? আপনি ঠিক হীরেনবাবুই ত'? না, আমারও ঘাড় মট্‌কাবার জন্যে হীরেনবাবুর গলার স্বরে আমাকে ডাকছেন?"

হীরেন চীৎকার ক'রে উঠল, "আরে মশাই, আমি হীরেন, হীরেন, জলজ্যান্ত আস্ত মানুষ হীরেন। কি বললে যে আপনার বিশ্বাস হবে যে আমি ভূত নই মানুষ, তাও যে মাথায় আসছে না ছাই। আরে মশাই, আপনার ভয় নেই, শীগ্‌গির দরজা খুলুন, আমি ভূত নই। ভূতেরা 'রাম' নাম উচ্চারণ করতে পারে না। এই শুনুন আমি বলছি, রাম-রাম! লক্ষ্মণ-লক্ষ্মণ!"

খটাস্‌ করে দরজার খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেই অরুণবাবু হীরেনকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর ধরা-গলায় আম্‌তা আম্‌তা ক'রে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কি···কি ব্যাপার হীরেনবাবু?"

হীরেন তখন রাত্রে ঘরে খিল এঁটে শোবার পর থেকে একটু আগে কাউণ্টের মূর্ত্তি ঘরে-ঢোকা পর্য্যন্ত সব কথা গুছিয়ে বলতে লাগল, "কাউণ্টকে দেখে আমি রিভলভারের গুলী দ্বারা তাকে অভ্যর্থনা করলুম। কিন্তু একবার যার মৃত্যু হয়েছে, সামান্য রিভলভারের গুলী তার কি ক্ষতি করতে পারে! আমার গুলী দিব্বি পরিপাক ক'রে কাউণ্ট তবু অদৃশ্য হচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বাইরে থেকে একটা পাথরের প্রচণ্ড আঘাতে···ঐ দেখুন অরুণবাবু, কাউণ্টের ছিন্নমুণ্ড ধূলোয় লুটোচ্ছে।"

ঘরের আবছা আলো-অন্ধকারে মেঝের দিকে চোখ পড়তেই অরুণবাবু একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে দু'পা পেছিয়ে গেলেন। সত্যিইত! এ যে যথার্থই কার ছিন্নমুণ্ড!

হীরেন বললে, "এখন আর ভয় নেই অরুণবাবু। কাউণ্টের প্রেতাত্মাও এবার ধরাশায়ী হয়েছে। প্রেতাত্মার ছিন্নমুণ্ড এখন আমাদের চোখের সুমুখে! আসুন, এখন একবার ভাল করে দেখে নিই।"

এই বলে সে তাড়াতাড়ি তার টর্চ্চটা খুঁজে বার করলে, তারপর টর্চ্চ হাতে সেই মাথাটার দিকে এগিয়ে গেল।

একি! এ যে একটা পরম বিস্ময়!

হীরেন দেখলে, অরুণবাবুও দেখলেন, সেই মাথাটা একটা জমাট্ শুক্‌নো মাথা, তাতে রক্তমাংসের চিহ্নমাত্র নেই! ধড় থেকে যেখানে কেটে গেছে, সে-জায়গাটা একটা এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো ভাঙ্গা পুতুলের গলার মতো।

—"অরুণবাবু? একি? একি পুতুল খেলা হচ্ছে? কেউ কি আমাদের পুতুল দিয়ে ভেল্‌কি দেখাচ্ছে?"

হীরেন পরক্ষণেই নিজেকে সংযত ক'রে বললে, "না, না, সে অসম্ভব! এ তো ভেল্‌কি হ'তে পারে না! আমি নিজে দেখেছি, নিজের চোখে দেখেছি, কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডো ঠিক তার ঐ কটোর স্বরূপ নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল—গুলী খেয়েও নির্ব্বিকার ভাবেই এগিয়ে আসছিল।

কাঠের পুতুল কখনো চলতে পারে না অরুণবাবু। কাজেই, এ কখনো প্রেতাত্মার ছিন্নমুণ্ড নয়, এ হচ্ছে প্রেতাত্মার খোলস।"

অরুণবাবুর মুখ থেকে তখন আর কোনো কথা বেরুচ্ছিল না, ভয়ে তাঁর সর্ব্বশরীর থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপছিল।

হঠাৎ জানলার দিকে খুট্‌ করে একটা শব্দ! দুজনেরই চোখ পড়ল সেই দিকে, দেখে দুজনেই চম্‌কে উঠল। তারা দেখতে পেলে, একটা প্রকাণ্ড বীভৎস মানুষের মাথা জানলা দিয়ে একদৃষ্টে ঘরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার আগ্রহ-ভরা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রয়েছে ঘরের ভেতরের সেই ছিন্নমুণ্ডুটার দিকে।

আবছা আলো-অন্ধকারে লোকটাকে ভাল ক'রে দেখা গেল না। তবে তাঁদের বোধ হ'ল যেন সে একটা বিশালদেহী চীনেম্যানের মুখ।

ওরা জানলার দিকে তাকাতেই সেই লোকটাও তাদের দেখতে পেলে। পরমুহূর্ত্তেই জানলার সেই মুখখানা অদৃশ্য হয়ে গেল।

অরুণবাবু দ্রুত পদক্ষেপে জানলার দিকে অগ্রসর হতেই হীরেন তাঁকে বাধা দিয়ে বললে, "পাগলামী করবেন না অরুণ-বাবু! আমার মানসিক ও শারীরিক শক্তি আপনার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আমি কাপুরুষও নই। আমিও জানলায় ঐ মুখ দেখেছি। তবুও ঐ অজ্ঞাত মুখের মালিকের সম্মুখীন হওয়া সঙ্গত নয় অরুণবাবু। অবশ্য, আমাদের কাছে একটা রিভলভার আছে, কিন্তু তা দিয়ে এই রাতের অন্ধকারে আমাদের বিশেষ কিছু সুবিধে না হওয়াই সম্ভব। কাজেই, ভোরের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।"

...পরক্ষণেই হীরেনের হাতের রিভলভারটা গর্জ্জন ক'রে উঠল·

পৃষ্ঠা—৩৯

এই সময় জানলায় হঠাৎ আবার সেই মুখখানার উদয় হ'ল। অরুণবাবু এবার যেন ক্ষেপে গেলেন। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "দাঁড়া, দাঁড়া শয়তান! আমার বন্ধু অজিতকে তোরা গ্রাস করেছিস—আমাদের এখানেও হানা দিতে আসছিস বার বার! দাঁড়া, এখুনি মজা দেখাচ্ছি।" বলতে বলতে অরুণবাবু উন্মত্তের মত তখুনি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

"থামুন, থামুন অরুণবাবু!" বলে হীরেনও তাঁর পিছু-পিছু ছুটে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় সে যাবে? বাইরে তখনো ভীষণ অন্ধকার! হীরেন হতাশ হয়ে ইতস্তত চারদিকে তাকাতে লাগল।

সাত

ভোরের আলোতে হীরেন তার ঘর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও কয়েকজোড়া অস্পষ্ট পদচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলে না। সেগুলো দেখতে অবিকল ঠিক মানুষের পায়ের মতই। তাহলে কাল রাত্রে তার ঘরে যার আবির্ভাব হয়েছিল সে শুধু কাউণ্টের অশরীরী আত্মামাত্র নয়, কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডো স্বয়ং সশরীরেই তার ঘরে নৈশ অভিযান করেছিল।

পায়ের চিহ্নগুলো ঘরের ঠিক মাঝখানে গিয়েই অদৃশ্য হয়েছে। এইখান থেকেই কাল রাত্রে কাউণ্ট শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছিল আর তাতে কৃতকার্য্যও হয়েছিল। অনেকটা গোটা দেহই সে লুকিয়ে নিয়ে গেছে, শুধু ফেলে রেখে গেছে মাথার একটা খোলস—একটা কাঠের মাথা। হীরেন ভাবলে, কিন্তু ঠিক এইখানটায় অতবড় একটা মূর্ত্তি অদৃশ্য হ'ল কেমন করে?

বহু চেষ্টাতেও সে এই প্রশ্নের কোনও সমাধান করতে পারলে না, তারপর হতাশ হয়ে সে-চিন্তা সে ছেড়ে দিলে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ল অরুণবাবুর কথা। হায়, কোথায় তিনি? নিজের একগুঁয়েমির জন্যে না-জানি ভদ্রলোক আজ কোন্ অজ্ঞাত বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়েছেন।

ভাবতে ভাবতে অরুণবাবুর বিছানার দিকে তার চোখ পড়ল। চোখ পড়তেই সে দেখতে পেলে সেখানে একটা চিঠি পড়ে রয়েছে।

সে তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে গেল এবং অতি আগ্রহে সেই চিঠিখানা তুলে নিলে। কিন্তু চিঠিখানা পড়েই সে চমকে উঠল। তাতে লেখা রয়েছে, "অরুণবাবু অদৃশ্য হয়েছেন। সতর্ক থেকো, সব দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখো।"

চিঠিটা কে লিখেছে? কাকে লিখেছে? যুগপৎ এই গুটিকয়েক প্রশ্ন তার মনের ভেতর উঠে তাকে বিহ্বল ক'রে ফেললে।

তার মনে হ'ল, সমীর ছাড়া তাকে সাবধান করে দেবার মত এখানে আর কে আছে! কিন্তু আজ দুদিন থেকে সে-ও ত এখানে নেই! তবে কে এই চিঠির লেখক?

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট শব্দ হতেই হীরেন জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেলে, একটা ঘন কালো ঝাঁকড়া-দাড়িওলা জোয়ান লোক জানলা দিয়ে উঁকি মেরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক দেখছে।

হীরেন মনে করলে, লোকটা তাকে বোধহয় লক্ষ্য করেনি। সুতরাং সে সেই লোকটাকে সতর্ক হবার সুযোগ না দিয়েই এক লাফে জানলার ধারে পৌঁছে দু'হাতে দৃঢ়মুষ্টিতে তার দাড়ি চেপে ধরলে। তারপর কর্কশকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে

বললে, "শয়তান! এবার আর তোর কোনমতে নিস্তার নেই। ঘুঘু দেখেছ, এবার তার ফাঁদ দেখ বাছাধন! রিভলভারের গুলীতে তোমার প্রকাণ্ড খুলিখানা ঝাঁঝরা করে দিতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হবে না মনে রেখ।"

হীরেনের প্রচণ্ড আকর্ষণে লোকটি ষাঁড়ের মত চীৎকার ক'রে বলে উঠল, "উঃ! কর কি হীরেন? শীগ্‌গির আমার দাড়ি ছেড়ে দাও। নইলে খুনের দায়ে তোমায় ফাঁসি যেতে হবে বলে রাখছি।"

লোকটির গলা শুনে হীরেন চমকে উঠে তার দাড়ি ছেড়ে দিলে। তারপর স্তম্ভিতভাবে তার দিকে তাকিয়ে বললে, "কি আশ্চর্য্য! ইন্‌স্পেক্টর—বীরেনবাবু? আপনি হঠাৎ এই অদ্ভুত বেশে এখানে?"

বীরেনবাবু তাঁর গালে হাত বুলোতে-বুলোতে রাগত ভাবে বললেন, "উঃ! তোমার মত গুণ্ডার সঙ্গে এখানে এমন ভাবে দেখা হবে জানলে কে আর এখানে আসত? তোমার বিপুল বিক্রমে আমার সখের দাড়ির কয়েকগাছা ত' দূরের কথা, প্রাণটাই খাঁচা-ছাড়া হবার জোগাড় হয়েছিল আর কি! ওই ত' তোমাদের প্রধান দোষ! মাঝে-মাঝে এমন এক-একটা খাপ্‌ছাড়া কাজ ক'রে বস যে, তাতে তোমাদের কাছে আসতেও আমার ইচ্ছে হয় না। আমার দাড়ির ওপর তোমার এই আক্রোশের কারণটা কি বলত বাবু?"

হীরেন অপ্রতিভভাবে বললে, "ক্ষমা করবেন বীরেনবাবু। আমি আপনাকে দাড়ি-গোঁফবিহীন ভদ্রলোক বলেই জানতুম। কিন্তু হঠাৎ যে এমন রাতারাতি দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে বান-প্রস্থের জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন, এ-সংবাদটা আমার জানা ছিল না মোটেই। তার চেয়ে বরং আগে থাকতেই আপনার এই চেহারার একটা ফটো এবং আপনার এখানে আগমনের সংবাদটা আমাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

বীরেনবাবু রাগতভাবে বললেন, "সাধে কি আর এই দাড়ি-গোঁফের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি? এটা আমার ছদ্মবেশ, মানে, আমি এখানে তদন্তে এসেছি।"

হীরেন হেসে বললে, "ও, তাই বলুন! কিন্তু হঠাৎ আমাদের কোনও খবর না দিয়ে ছদ্মবেশে এখানে তদন্তে আসবার কারণটা কি বীরেনবাবু? আপনি ত' বলেছিলেন যে আপনার হাতে জরুরী কাজ রয়েছে এবং আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে নীলপুরে আসতে আপনার দু'তিন দিন দেরী হবে! অথচ হঠাৎ ছদ্মবেশে এখানে আপনি উদয় হলেন কিসের তদন্তে, জানতে পারি বোধহয়?"

বীরেনবাবু বিস্ময়ের সুরে বললেন, "কেন, তুমি জান না? সমীরই ত' আজ আমাকে এখানে আসবার জন্যে কাল টেলিগ্রাম করেছে।"

হীরেন ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললে, "কি বলছেন?

টেলিগ্রাম করেছে? সমীর? সে কি তাহলে কলকাতায় যায়নি? আমি ত ভেবেছিলুম, কলকাতায় যাচ্ছে সে-আপনারই কাছে।"

বীরেনবাবু উত্তর দিলেন, "তুমি কি ভাবছ বা ভেবেছিলে তা আমি জানি না। কিন্তু কাল রাত্রে আমি সমীরের টেলিগ্রাম পেয়েছি। আমাকে সে কতকগুলো পুলিশ নিয়ে এখানে আসবার জন্যে অনুরোধ করেছে। নীলপুরের রহস্যময়-নিরুদ্দেশ-তদন্তে আমি তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব বলেছিলুম। সে তাই উল্লেখ করে আমায় জানিয়েছে যে, আমি যদি পৃথিবীর একজন অদ্ভুতকর্ম্মা বৈজ্ঞানিক এবং রহস্যময় পাপীকে গ্রেপ্তার করতে চাই, তাহলে যেন ছদ্মবেশে নীলপুরের এই বাংলোতে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করি। এর বেশী তার কাছ থেকে আমি কিছুই জানতে পারিনি। ব্যস্! তারপর তার কথামত ছদ্মবেশে এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে তোমার হাতেই দাড়িসমেত প্রাণ নিয়ে টানাটানি আর কি! তা যাই হোক্, এখন এখানকার ব্যাপারটা কি আমায় খুলে বল।"

হীরেন এখানে আসার পর থেকে যা কিছু ঘটেছে, একে-একে সব কথাই বীরেনবাবুর কাছে খুলে বললে। সব কথা শুনে বীরেনবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, "অদ্ভুত বটে! আমাকে এখানে আসতে বলে সমীর নিজেই নিরুদ্দেশ! আর 'বৈজ্ঞানিক'

এবং 'রহস্যময় পাপী' তার এই কথা দু'টো বলবার উদ্দেশ্য কি? তুমি কিছু বুঝতে পারছ হীরেন? আমি যে এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

হঠাৎ খানিকটা দূরে একটা কাতর আর্ত্তনাদ, "ওরে বাবা, মেরে ফেল্‌লে রে, মেরে ফেল্‌লে! বাঁচাও—বাঁচাও!"

বীরেনবাবু ও হীরেন দু'জনেরই চোখ পড়ল সেই দিকে। যে-দৃশ্য তারপর তাদের চোখে পড়ল, তাতে তারা শিউরে উঠল,—তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

দেখা গেল, একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলেকে দুটো ষণ্ডা লোক প্রায় চ্যাংদোলা করে তুলে একটা কবরের ভেতর ঠেসে দেবার চেষ্টা করছে। ছেলেটার নাক-মুখ ও মাথা বেয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বীরেনবাবু উত্তেজিতস্বরে বললেন, "দেখছ হীরেন, লোকগুলো কি নিষ্ঠুর! চল দেখি, ওদের একবার বেশ ক'রে শিক্ষা দিয়ে আসি।" বলেই তিনি তাঁর বিশাল ভুঁড়িটাকে দোলাতে দোলাতে লোক দু'টোর উদ্দেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চললেন। হীরেনও রাগে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁর পেছনে পেছনে ছুটল।

সেদিকটা ফাঁকা মাঠ। কেবল মাঝে-মাঝে এখানে-সেখানে দু'একটা বড় বড় গাছ দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে নীলপুরের রহস্য আরো জমাট ও ঘনীভূত ক'রে তুলছিল।

একটা তেঁতুলগাছের তলা দিয়ে যাবার সময় গাছের একটা উঁচু ডাল সশব্দে মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। হীরেন ও বীরেন-বাবু মুহূর্ত্তের জন্যে দু'জনেই সেদিকে একবার তাকালেন, কিন্তু পরক্ষণেই ছেলেটাকে বাঁচাবার আগ্রহে আবার তাঁরা সেই ঘটনাস্থল লক্ষ্য ক'রে ছুটে চললেন।

খানিকটা এগোতেই একটা আমগাছ। তার তলা দিয়ে যেতেই ওপর থেকে হঠাৎ একখানা জাল এসে তাদের মাথায় বিছিয়ে পড়ল। একটা কিছু আশঙ্কা ক'রে বীরেনবাবু তা কেটে বেরোবার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় গাছের ওপর থেকে ঝুপ্‌ঝুপ্ করে কয়েকটা লোক লাফিয়ে পড়ল—তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে বর্শা!

মাটিতে নেমে একজন বললে, "খবর্দ্দার! কেউ পিস্তলে হাত দিয়েছ কি অমনি গেঁথে ফেল্‌ব! চুপ করে থাকো।"

এই দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ দূরের দৃশ্যটাও বদলে গেল। দেখা গেল, সেই রক্তমাখা ছেলেটা—যাকে জ্যান্ত কবরে দেবার জন্যে এতক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি হচ্ছিল,—হঠাৎ হাস্‌তে হাস্‌তে সে কবর থেকে উঠে এলো, আর বাকি লোকগুলোও হাসিমুখে বন্দী হীরেন ও বীরেনবাবুর দিকে এগিয়ে এলো তাদের ধ্বংসের জন্যে।

বীরেনবাবু কাতরকণ্ঠে বললেন, "হীরেন, আমাদের ভাগ্যচক্র এই মুহূর্ত্ত থেকে ঘুরে গেল ভাই! অন্যের নিরুদ্দেশ-

রহস্যের তদন্ত করতে এসে আজ এখন আমরাই নিরুদ্দেশ হতে যাচ্ছি। উঃ, কত বড় শয়তান ও ধূর্ত্ত ঐ ছোঁড়াটা আর লোকগুলো! ওদের কৌশলে আজ আমরাই ওদের মুঠোয় বন্দী হলুম। হায়! সমীর যদি এসময় এখানে থাকত!"

বীরেনবাবুর চোখে তখন উচ্ছ্বসিত জলধারা! আর হীরেন? রাগে ও অপমানে সে তখন স্তব্ধ—নির্ব্বাক্।

আট

—"ছোঁড়াটাকে আটকে রেখেছ ত' গুল্‌জারসিং?" সমীরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও সুস্পষ্ট।

গুলজারসিং বললে, "হাঁ বাবুজি, ওকে আটকেছি। ছোঁড়া পাঁচ টাকা বখশিস্ পেয়ে কি অভিনয়টাই না করলে! নাকে-মুখে ও মাথায় আল্‌তা লাগিয়ে দিব্যি আহত হওয়ার ভানটা করলে, সঙ্গে সঙ্গে কবরটাকে কেন্দ্র ক'রে আরম্ভ হ'ল তাদের ধ্বস্তাধ্বস্তি। ইন্‌স্পেক্টরবাবু আর হীরেনবাবু সেটাকেই সত্যিকার ধ্বস্তাধ্বস্তি মনে ক'রে ছুটে এলেন। আর তারই ফলে আজ তারা নিখোঁজ!"

সমীর বললে, "কি বল্‌ব গুল্‌জারসিং, আমার তখন নিজের আঙুল নিজে কামড়াবার ইচ্ছে হচ্ছিল। মানুষ কখনো এমন বোকা হয়? ছদ্মবেশে আসতে বলেছিলাম কেন? সে কি এসেই হীরেনের সঙ্গে একটা তুমুল কাণ্ড বাধাবার জন্যে? হীরেন আর বীরেনবাবুতে মিলে যখন দাড়ি-টানাটানির ব্যাপারটা চলছিল, আমি তখুনি তেঁতুল-গাছের ওপর বসে থেকে অনুমান করেছিলুম, তাঁদের এই বোকামিতে তাঁরা আজ ধরা পড়ে গেলেন! কে তাঁরা, কেন এসেছেন, সেকথা কি

আর কারো বুঝতে বাকি থাকে? কাজেই, তখুনি সুরু হ'ল তাঁদের দুজনকেই ফাঁদে ফেলবার ষড়্‌যন্ত্র।

তাঁরা যখন তেঁতুলগাছের তলা দিয়ে ছুটে যাচ্ছিলেন, আমি তখন একবার বারণ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে গাছের একটা ডাল নাড়া দিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু সবই বৃথা হ'ল। অসহায় দুর্ব্বলের মত তাঁরা আজ বন্দী।"

দুঃখে ও অপমানে সমীর একেবারে অভিভূত হয়ে গেল।

গুল্‌জারসিং বললে, "এখন উপায় কি হবে বাবুজি?"

—"উপায়? হাঁ, উপায় একটা কিছু বার করতেই হবে।" অন্যমনস্কভাবে সমীর বললে।

আধ মিনিট নীরব থেকে সে বলতে লাগল, "শোনো গুল্‌জারসিং—কথাটা ভাল ক'রে বুঝে নাও।"

—"বলুন বাবুজি!"

সমীর চিন্তিতভাবে বললে, "একটা কিছু চালাকি করতে হবে গুলজারসিং! শোনো কি করবে। তোমরা সিপাই এসেছ পনেরো জন, না?"

—"আজ্ঞে হাঁ, আমাকে ছাড়া আরো পনেরো জন।"

—"বেশ। কেবল তোমাকে আমি চাই আমার সঙ্গে। বাকি পনেরো জনকে বলে দাও, তারা পাঁচজন-পাঁচজন ক'রে তিন দলে বিভক্ত হয়ে—একদল লক্ষ্য রাখবে ঐ গম্বুজটার

দিকে, একদল নজর রাখবে মাঠের এই অংশটায়। আর বাকি দল মাঠের এখানে-সেখানে দল বেঁধে পূরোপূরি পুলিশী-সাজে ঘুরে বেড়াবে ও খানিকটা পরপর মাঝে-মাঝে বন্দুকের আওয়াজে চারদিক কাঁপিয়ে রাখবে।

আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের বিপক্ষ দলকে বুঝতে দেওয়া যে, পুলিশ যা-কিছু সন্দেহ করছে, সে হচ্ছে কেবল এই দুটো জায়গা—কিন্তু নীলকুঠি তাদের লক্ষ্যস্থল নয়।

কিন্তু আমি জানি, নীলকুঠিও একেবারে রহস্যছাড়া নয়। হীরেনটার সেদিনই বোঝা উচিত ছিল যে, বাইরে থেকে আমি যে পাথরটা ছুঁড়েছিলুম তার আঘাতে ভূত বা মানুষ—কারো কেবল মাথাটা খুলে যেতে পারে না। আর তখুনি তার বোঝা উচিত ছিল যে, অতবড় মূর্ত্তিটার বাকী অংশটুকু কোথায় তলিয়ে গেল। তার খোঁজ করা উচিত ছিল ঐ নীলকুঠিতেই। তাহলেই সম্ভবত অনেক কিছু খোঁজ পেতে পারত।

সে যাই হোক্, সে যেটুকু করেনি, সেটুকু আমি করতে চাই, আর তুমি হবে আমার সাহায্যকারী! আমরা দু'জনে গোপনে নীলকুঠিতে ঢুকে অনুসন্ধান আরম্ভ করব। ততক্ষণ অন্যান্য সিপাইরা বাইরে খুব ধূম-ধড়াকা করে বিপক্ষের দলে একটা আতঙ্কের ভাব জাগিয়ে রাখবে। আর, এর মাঝে ওই ছোঁড়াটার কথাও ভুললে চলবে না। তার কাছে কতটুকু

আদায় করা যায় সে চেষ্টা করতেই হবে। বুঝলে গুল্‌জারসিং, কি আমি করতে চাই ?”

—“হাঁ, বাবুজি।”

সমীর বললে, “তাহলে সেইভাবে সবাইকে তৈরি হতে বলে দাও।”

—“যো-হুকুম !”

গুল্‌জারসিং সেলাম ক’রে ঝোপের আড়ালে চলে গেল। সমীর তখনও গম্ভীরভাবে বনের অন্ধকারেই গা ঢাকা দিয়ে বসে রইল।

নয়

জ্ঞান হ'তেই হীরেন দেখতে পেলে সে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটা ঘরে পড়ে রয়েছে। বহুমূল্য নানারকম সৌখীন জিনিষে ঘরটা সাজানো, কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয় চীনেম্যানের বাসস্থানের মত।

ঘরের দরজার সামনে একটা হলদে রংয়ের রেশমী পরদা। তার মাঝখানে ঘোর লাল রংয়ের একটা প্রকাণ্ড বাদুড়ের মূর্ত্তি। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন সেটা জীবন্ত। টেবিলের ওপর অসংখ্য ওষুধপত্র, ছুরি-কাঁচি ও ইঞ্জেক্শানের যন্ত্র।

হীরেন অবাক্ হয়ে এসব দেখছিল। একে-একে সব কথা তার মনে পড়ল। তার মনে হ'ল, শত্রুদের জালে তারা আটক হ'লে, জালে জড়িয়েই তাদের কাঁধে ক'রে খানিকটা দূর ওরা নিয়ে আসে। তারপর একটা গাছের তলা থেকে একটা পাথর সরিয়ে তারা সুড়ঙ্গপথে ওদের এইখানে নিয়ে আসে।

হীরেন ভাবলে, কিন্তু বীরেনবাবু কোথায়? তাঁকে দেখছি না কেন?

হঠাৎ পেছনে কারও পায়ের শব্দ পেয়ে হীরেন ফিরে তাকিয়ে একটা বিশালদেহী চীনেম্যানকে দেখতে পেলে।

চীনেম্যানটা ঘরে ঢুকে কয়েক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে হীরেনকে লক্ষ্য করলে। তারপর তাকে তুলে কাঁধে ফেলে সে অতি সহজেই ঘর থেকে বেরিয়ে সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথেই আবার কোথায় এগিয়ে চলল। হাত-পা বাঁধা থাকার দরুণ হীরেন তার এই কাজে বিন্দুমাত্র বাধা দিতে পারলে না। তবে সে এটুকু বুঝলে যে, মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত এই দানবটার হাত থেকে তার নিষ্কৃতি পাবার কোনো পথই নেই।

হীরেনকে কাঁধে করে চীনেম্যানটা সুড়ঙ্গ দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আর একটা ঘরে ঢুকল।

সেই ঘরে ঢুকতেই হীরেন দেখতে পেলে, ঘরের মাঝখানে একটা লোক নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে বোধহয় তাদেরই প্রতীক্ষা করছে। তাকে দেখেই হীরেন চিনতে পারলে এ আর কেউ নয়—কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডো স্বয়ং।

হীরেন দেখলে, কাউণ্টের সামনে তিনটে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে আরো তিনটে লোক। তাদের একজন অরুণবাবু, দ্বিতীয়জন ইন্স্পেক্টর বীরেনবাবু আর তৃতীয় ব্যক্তি অজ্ঞাত। হীরেনের মনে হ'ল, সম্ভবত এ হচ্ছে সেই অজিত—অরুণবাবুর নিরুদ্দিষ্ট বন্ধু।

চীনেম্যানটা হীরেনকে মাটিতে না নামিয়ে, হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে। তারপর সে সেই ঘর থেকে নিঃশব্দে অদৃশ্য হ'ল।

কাউণ্ট কয়েক মুহূর্ত্ত বন্দীদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ পিশাচের মত হো হো ক'রে হেসে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে বললে, "মূর্খের দল! তোমাদের এই দুরবস্থার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু কোনো উপায় নেই। ডাক্তার হিরোতার কাজে অনধিকার চর্চ্চার ফল তোমাদের ভোগ করতেই হবে। তবে তোমাদের হৃৎপিণ্ডগুলো দিয়ে যে মানুষের সমাজের কিছু উপকার হবে—তার জন্যে নিজেদের অদৃষ্টকে তোমরা ধন্যবাদ দিতে পার।"

কাউণ্টের এই সাংঘাতিক কথা শুনে হীরেন স্তম্ভিত হ'ল। একি বদ্ধ উন্মাদ, না মানুষের দেহে কোনও শয়তান বিশেষ? ডাক্তার হিরোতা কে? তাদের হৃৎপিণ্ড দিয়ে মানুষের সমাজের উপকার হবে—কাউণ্টের এসব কথার মানেই বা কি?

হীরেনের মনের ভাব বুঝতে পেরে কাউণ্ট মৃদু হেসে বললে, "বড় আশ্চর্য্য হচ্ছে আমার কথা শুনে, না? তা হবারই কথা। যাই হোক, তোমাদের আগে যারা এখানে এসেছে, আমার এই কথা শুনেই তারা মূর্চ্ছিত হয়েছে। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলে তোমরাও বুঝতে পারবে যে আমার এই পরীক্ষা বিশাল পৃথিবীর মানুষের উপকারের জন্যেই। আমি ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানুষ জাতটাকে অজর-অমর করতে চাই। তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এবং সেই শুভ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আমার প্রয়োজন গুটিকয়েক হৃৎপিণ্ড। সেজন্যে

···এ আর কেউ নয়—কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডো স্বয়ং·

পৃষ্ঠা—৫৯

তোমাদের মত দু'চারজনের যদি মৃত্যুও ঘটে, তাহলেও তোমাদের জীবন সার্থক হবে।"

সকলেই মহা আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে কাউণ্টের কথা শুনছিল—কথা বলবার সমস্ত শক্তি পর্য্যন্ত যেন তাদের কখন কোন মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হয়ে গেছে! অত বড় দুর্দ্ধর্ষ সাহসী ও শক্তিশালী ইন্‌স্পেক্টর বীরেনবাবুও যেন ভয়ে ও হতাশায় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। কিন্তু হীরেন তখনও পর্য্যন্ত নিজের বুকটাকে শক্ত রাখবারই চেষ্টা করছিল—কাউণ্টের সদম্ভ কথাগুলো সে নীরবে হজম করতে পারলে না।

সে এইটুকু বুঝতে পেরেছিল, তার সামনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে শয়তান বললেও সম্মান করা হয়। জীবন্ত মানুষের হৃৎপিণ্ড নিয়ে এ কোন্ খেলা খেলতে চায়, তা সে কিছু ঠিক করতে না পেরে কর্কশকণ্ঠে বললে, "শয়তান! তোমার মতলবটা পরিষ্কার করে খুলে বল। আমাদের হৃৎপিণ্ডে মানুষের কি উপকার হ'তে পারে তা আমি বুঝতে পারছি না। আমাদের হৃৎপিণ্ড নিয়ে তুমি কি করতে চাও?"

কাউণ্ট হীরেনের কথায় কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, "ধীরে, বন্ধু, ধীরে! তুমি আমাকে যে-ভাষায় সম্ভাষণ করলে, তোমার বুদ্ধি থাকলে বুঝতে পারতে যে আমি ঠিক তার উপযুক্ত নই। সে যাই হোক—আমার সময় অতি অল্প। সুতরাং তোমাদের সাময়িক মৃত্যু ঘটবার আগে, আমার উদ্দেশ্য

তোমাদের কাছে খুলে বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমার বক্তব্য শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে আমার উদ্দেশ্য কত মহৎ। এপর্য্যন্ত দেবতারাও মানুষকে যা দিতে পারেনি সেই অমরত্ব প্রদান করবার জন্যেই আমি এই পাতালপুরীতে বাস ক'রে এত কষ্ট এবং পরিশ্রম স্বীকার করছি। এবং সেই অমরত্ব লাভ করবার সৌভাগ্য প্রথমে তোমাদের অদৃষ্টেই ঘটবে, এজন্যে আমাকে তোমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো উচিত।"

কাউণ্ট বলে চলল, "বন্ধুগণ! অনেকদিনযাবৎ এখানে আছি, কিন্তু আমার এমন সৌভাগ্য ক..না হয়নি। এর আগে যা পেয়েছি, সে হ'ল কদাচিৎ দু'একজন লোক। তাদের হৃৎপিণ্ড খুলে নিয়ে ওইসব কাঁচের পাত্রে জমা ক'রে রেখে দিয়েছি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আমার সেসব পরীক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

তাদের হৃৎপিণ্ড খুলে নিয়ে বৈজ্ঞানিক-প্রক্রিয়ায় সেইসব হৃৎপিণ্ডে রক্ত চালু ক'রে আমি আবার তাদের জীবন ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু পারিনি। কাজেই তাদের হৃৎপিণ্ডগুলো খুলে রেখে, হৃৎপিণ্ডহীন মানুষগুলোকেই নকল চামড়া ও নকল মেদের সাহায্যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক চেহারা ফিরিয়ে দিয়ে, নীলপুরের জঙ্গলে এখানে-সেখানে ফেলে রেখে দিই। তোমাদের মত মুর্খের দল তাই নিয়ে কাগজে-পত্রে অনেক-কিছু আন্দোলন সুরু করেছিল।

তারপর থেকে কিছুকাল সুযোগ খুঁজছিলুম। ভাবছিলুম, একসঙ্গে গুটিকয়েক লোক পেলে সম্ভবত পরীক্ষাটা সফল হবে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বন্ধ করা যায়, তাহলে হয়ত তাদের কোন-না-কোন হৃৎপিণ্ড আমাকে অমরত্ব প্রদানের অধিকারী করবে।

একসঙ্গে কয়েকটি লোক পাওয়ার মত পরম সৌভাগ্য যে লাভ করব তা আমি কোনদিনই আশা করিনি। অজিত ছেলেটা খুব পয়মন্ত মনে হয়। তা নইলে ওর পেছনে তোমাদের মত আরো তিন-তিনটি মূর্খের উদয় হবে কেন ?

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব ! বড় আশা করে ছদ্মবেশে এসেছিলে। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দেবার মত শক্তি এখনো অর্জ্জন করতে পারনি। যাই হোক্, ভালই হয়েছে। আমার এই বৈজ্ঞানিক-যজ্ঞে তোমাকেই করব আমার প্রধান বলি।

প্রধান বলি এই হিসেবে বলছি যে, তোমার হৃৎপিণ্ডটাকে আমি শ্রেষ্ঠ সম্মান দেব, তাকে কোনো সাধারণভাবে নিষ্ক্রিয় করা হবে না।

তোমার হৃৎপিণ্ডকে নিষ্ক্রিয় করব মনোবিজ্ঞানের দার্শনিক-পন্থায়। গভীর আতঙ্কে তুমি শিউরে উঠবে, তোমার বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হবে, তোমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর তোমার সেই হৃৎপিণ্ড খুলে নিয়ে, বৈজ্ঞানিক-পন্থায় আমি আবার তাকে স্বাভাবিক ক'রে তোমায় বাঁচাবার চেষ্টা করব।

ভাগ্যক্রমে যদি বেঁচে যাও, তাহলে তুমি হবে অমর—আর আমি লাভ করব অক্ষয় যশ ও সাফল্য।

তোমাদের বাকি তিনজনের হৃৎপিণ্ডকেও নিষ্ক্রিয় করা হবে তিনটি বিভিন্ন উপায়ে।

অজিতের হৃৎপিণ্ড বন্ধ করা হবে অধোমুখী-পন্থায়, মানে, তার পা দুটো ওপরে বেঁধে রেখে, মাথা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে নীচের দিকে। হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত বেরিয়ে এসে মাথায় উঠে জমা হবে—ধীরে ধীরে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যাবে বন্ধ হয়ে।

অরুণ ছোক্‌রার হৃৎক্রিয়া বন্ধ করব সমাধি-পন্থায়। মানে, তাকে দেওয়া হবে জ্যান্ত সমাধি। সমস্ত উষ্ণ রক্ত অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার হৃৎপিণ্ডের মধ্যেই জমাট বরফ হয়ে যাবে।

আর গোয়েন্দা হীরেনের হৃৎপিণ্ড খুলে নেব তা সম্পূর্ণ সজীব ও সচল থাকতেই। জীবনের স্পন্দন তার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণই থাকবে। অস্ত্রোপচারের অপরূপ কৌশলে, হীরেন সচেতন থাকতেই তার চলমান হৃৎপিণ্ডকে আমি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেব। সংক্ষেপে এই হচ্ছে আমার চার রকম প্রক্রিয়া।”

একটু থেমে কাউণ্ট আবার বলতে আরম্ভ করলে, “প্রথমে আমি পাঁচজন লোককে অমরত্ব প্রদান ক’রে জগৎকে দেখিয়ে দেব আমার এই অমূল্য আবিষ্কারের ফল। তারপর একদিন যশের মুকুট মাথায় নিয়ে আমি আমার পাতালপুরীর গোপন

আশ্রয় থেকে পৃথিবীর বুকে উদয় হব। তখন তোমাদের সভ্য জগতের আইনকে আমার আর গ্রাহ্য করবার দরকার হবে না। লোকে বুঝতে পারবে যে, মানুষের জীবন নিয়েও জীবন দান করা যায়—মরা মানুষ বেঁচে ওঠে এক অপূর্ব্ব অমরত্ব নিয়ে। আমি সাগ্রহে সেই শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় দিন গুনছি এবং সেই অমরত্ব লাভের তোমরাই হবে অগ্রগামী দল।”

কাউণ্ট একটা অস্ফুট শব্দ করতেই মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই ঘরে পূর্ব্বোক্ত চীনেম্যানটার আবির্ভাব হ'ল। তারপর কাউণ্টের ইঙ্গিতে সে দেয়ালের গায়ে একটা সুইচ টিপে ধরলে। সুইচটা টিপতেই ঘরের একধারের দেয়াল ধীরে ধীরে সরে গেল।

দেয়ালটা সরে যেতে হীরেন দেখতে পেলে, তাদের সামনেই রয়েছে একটা প্রকাণ্ড লম্বা হলঘর। সেই ঘরে সারি সারি লম্বা বড় বড় কাঁচের পাঁচটা কফিন সাজানো রয়েছে।

কাউণ্টের চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে হীরেনকে লক্ষ্য ক'রে বললে, “ওই কফিনগুলোর প্রত্যেকটার পাশে যে ছোট-ছোট কাঁচের জারগুলো রয়েছে, ওগুলোতে থাকবে তোমাদের জীবন্ত হৃৎপিণ্ড। আর ঐ কফিনগুলোতে তোমরা শুয়ে থাকবে—সাময়িক মৃত্যুর কোলে। এখনো যে একটা কফিন খালি রয়েছে, ওই কফিনে তোমাদের অপর বন্ধুটিকে পূরতে পারলেই আমি সবচেয়ে বেশী খুশী হতুম, কিন্তু উপায় নেই। সে হয়তো এযাত্রা পালিয়েই প্রাণে বেঁচে গেল।

হীরেন এতক্ষণ বিহ্বলভাবে সেই ঘরের নানারকম অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি—ছোট বড় নানা আকারের, নানা রংয়ের শিশিতে ভরা আলমারি—এইসব দেখছিল। কাউণ্টের শেষ কথায় তার চমক ভাঙ্গল। এতক্ষণে সে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝতে পারলে যে, সে কোনও উন্মাদ-বৈজ্ঞানিকের কবলে পড়েছে এবং সে আর কেউ নয়—বহু বৎসর পূর্ব্বে মৃত কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডো! এযাত্রা তার আর কোনমতে রক্ষে নেই। কাউণ্টের এই ভয়াবহ বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষার যূপকাষ্ঠে তাকে আত্মবলি দিতে হবেই। -

সে আর কিছু ভাবতে পারলে না। ধীরে ধীরে তার চোখের সামনে একটা কালো পর্দা নেমে এল। জ্ঞান হারাবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তার কানে অস্পষ্টভাবে ভেসে এল কাউণ্টের ভয়াবহ অট্টহাসি।

দশ

কতক্ষণ যে অজ্ঞান হয়ে ছিল তা হীরেনের মনে নেই। জ্ঞান হতে সে দেখতে পেলে সে একটা লম্বা অস্ত্রোপচারের টেবিলের ওপর শুয়ে রয়েছে। তার ঠিক পাশেই একটা বড় টেবিলের ওপর নানারকম বিদ্‌ঘুটে ভয়ানক যন্ত্রপাতি। আর সেই টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বয়ং কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডো ও তার অনুচর সেই চীনেম্যান্‌টা।

তাহলে তার অজ্ঞান অবস্থাতেই তাকে এই অস্ত্রোপচারের টেবিলটার ওপর শোয়ানো হয়েছে তার হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার করবার জন্যে! এরপর কি ঘটবে তা আর হীরেনের জানতে বাকি রইল না।

হীরেনের জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে কাউণ্ট ও তার অনুচর চীনেটার চোখে-মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

হীরেন একবার শেষ চেষ্টা করলে কাউণ্টকে ভয় দেখিয়ে তার কবল থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্যে। সে চীৎকার ক'রে বলে উঠল, "নরাধম! আমাকে এভাবে হত্যা করলে তোমাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে মনে রেখ। এর আগে নিষ্কৃতি পেয়েছ বলে, আমাকে হত্যা ক'রে তুমি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না। পুলিশের চোখে ধূলো দিতে পারবে না।"

কাউণ্ট ক্রুদ্ধ অথচ অতি মৃদুস্বরে বললে, "বৃথা আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ বন্ধু। আমার এই গোপন-পাতালপুরীর সন্ধান পাবে, এরকম পুলিশ আজ পর্য্যন্ত জন্মায়নি। সেই মূর্খ গোঁয়ারের দল আমার এই মহৎ বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারে বাধা দিতে পারে মনে করেই আমি পাতালপুরীতে এই বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষাগার স্থাপন করেছি। বিশেষত তুমি যে পুলিশ-বন্ধুর সাহায্য আশা করছ, সেই পুলিশ-বন্ধুটি এখন আমারই হাতে বন্দী।"

হীরেন বললে, "তুমি ভুল ধারণা করেছ ডাক্তার! ইন্‌স্পেক্টর বীরেনবাবু এখানে একা আসেন নি। তাঁর বিরাট পুলিশ-বাহিনী আশে-পাশেই লুকিয়ে আত্মগোপন করে আছে। অন্ধের মত কেবল নীলকুঠির দিকে নজর না রেখে যদি নীলপুরের সারা বনটার দিকে নজর রাখতে, তাহলে কুলী-মজুর বা রাখালের ছদ্মবেশে অনেক পুলিশই তোমাদের চোখে পড়ত।

কেবল তাই নয় ডাক্তার! গোয়েন্দা সমীর বোসকে তুমি এখনো গ্রেপ্তার করতে পারনি। তোমার ধ্বংসের জন্যে সে এখনো মুক্ত—সম্পূর্ণ মুক্তভাবেই রয়েছে। তুমি যত বড় কৌশলী বা ধূর্ত্তই হওনা কেন, সমীরকে ফাঁকি দিতে পার, এমন ক্ষমতা তোমার হয়নি এখনো।"

স্পষ্ট বোঝা গেল, হীরেনের কথায় কাউণ্টের মুখের ওপর যেন একটা ভয়ের কালিমা এসে গেছে! সে তখুনি তার

টেবিলের ওপরের একটা বেল টিপে কাউকে আহ্বান করলে।

বেল বাজতেই ঘরে ঢুকল অপর একটা চীনে। কাউণ্ট তাকে চীনে ও ইংরেজী-ভাষায় মিশিয়ে যে উপদেশ দিলে তার মর্ম্ম বুঝতে হীরেনের অসুবিধা হ'ল না।

কাউণ্ট বললে, "এই নীলপুরের জঙ্গলেই কতকগুলো ছদ্মবেশী পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের সব-কটাকেই গ্রেপ্তার করা চাই। আর চাই, গোয়েন্দা সমীরকে গ্রেপ্তার করা। বাইরে থেকে সুড়ঙ্গে যাতায়াতের যে তিনটে পথ আছে, সব ক'টা পথেই লোক বেরিয়ে যেন তাদের খোঁজ করে। আর, কোনো খোঁজ পাওয়া গেলে তখুনি এসে যেন তাকে খবর দেওয়া হয়—কাউণ্ট তাহ'লে নিজেই যাবে তাদের গ্রেপ্তার করতে।

এগারো

কাজল-কালো অন্ধকার রাত। নীলপুরের গভীর জঙ্গলের মাঝে একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথের মুখে গাছের তলায় ব'সে কয়েকজন চীনেম্যান জটলা করছিল।

হঠাৎ বহু দূরে একটা বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ জেগে উঠল, "গুড়ুম!" তারপর আবার খানিকক্ষণ সব চুপ! বাতাস নিঃসাড়, অরণ্যও নীরব। তারপরেই আচম্বিতে এমন ভয়াবহ প্রাণ-কাঁপানো আর্ত্তনাদের ঐকতান জেগে উঠে সেই স্তব্ধ নিশীথের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। একজন নয়, দুজন নয়—যেন অনেক লোক একসঙ্গে সভয়ে বা মৃত্যু-যাতনায় চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। দূরে বনের ভেতরে বিষম একটা ছুটোপাটির শব্দ হচ্ছে মনে হ'তে লাগল। তারপর আবার চুপ! কিছুক্ষণের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য আর কোনো ঘটনাই ঘটল না।

এইভাবে কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর কখনো দূরে, কখনো কাছে, দিকে দিকে ধ্বনিত হয়ে ওঠে আবার বন্দুকের প্রাণ-কাঁপানো শব্দ, 'গুড়ুম! গুড়ুম!'

শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। সহসা মনে হ'ল, কাছেই কোথাও কয়েকটা বড় বড় গাছ সশব্দে দুলে-দুলে উঠল।

অন্ধকারে দেখা না গেলেও, চীনেম্যানদের দল থেকে যে কুৎকুতে-চোখ, বলিষ্ঠ দেহ লোকটি বর্শা হাতে উঠে দাঁড়ালো, সে হচ্ছে ওই দলের চাঁই, চ্যাং। চ্যাং উঠে দাঁড়িয়ে দলের লোকদের দিকে ফিরে আদেশের সুরে তার ভাষায় বললে, "সাবধান! আশে-পাশেই কোথাও শত্রুরা হানা দিয়েছে। খুব হুঁসিয়ার! দুজন ঘাটি আগ্‌লে এখানে বসে থাক্, আর বাকি সবাই পা টিপে-টিপে আমার পিছু-পিছু চলে আয়।"

সর্দ্দারের আদেশ পালন করবার জন্যে দু'জন বাদে সবাই তৈরি হল। তারপর শব্দ আন্দাজ ক'রে সেই গাছগুলোর তলায় এসে দাঁড়াতেই তারা একরকম গোঙানির শব্দ শুনতে পেলে। তারপর নিকষ-কালো অন্ধকার চিরে ফুটে উঠল, চ্যাংয়ের হাতের টর্চ্চের আলো! সেই হঠাৎ-আলোর ঝলকানি মুখে পড়তেই যে-লোকটি অস্পষ্ট জড়িত-ভাষায় করুণভাবে একটু জল চাইলে, তাকে দেখে চ্যাং একেবারে নিরাশ হ'য়ে গেল। সে ওদের শত্রু পুলিশ নয়, সর্ব্বাঙ্গে রক্তমাখা সামান্য একজন কাঠুরিয়া।

ধুঁকতে-ধুঁকতে সেই আহত-কাঠুরিয়াটি বললে, "ওগো, আর আমাকে মেরো না গো! আমরা তোমাদের কোনো দোষ করিনি। তবুও তোমরা যা চাও তার আর দেরী নেই।

তোমাদের আশা এখুনি পূর্ণ হবে। কিন্তু তার আগে একটু জল! একটু জল পেলে তোমাদেরও নিশ্চিন্ত করব, আমিও নিশ্চিন্ত হব।"

তার মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে চ্যাং বললে, "জল ত' আমাদের সঙ্গে নেই, আমি লোক পাঠাচ্ছি, এখুনি জল এসে পৌঁছবে, কিন্তু তুমি কে? এই আঁধার রাতে, এমন গভীর বনের ভেতরেই বা এসেছিলে কেন, আর তোমার এ দশাই বা করলে কে?"

অস্পষ্ট ভাষায় থেমে-থেমে কাঠুরিয়া বললে, "সব কথা গুছিয়ে বলতে পারবো না গো! শুধু এইটুকু শুনে নাও, আমরা কাঠুরে, কাঠ কাটতে-কাটতে বনের ভেতর সন্ধ্যে এলো, দূরে 'ফেউ' ডাকতে লাগল। বাঘ বেরোবার ভয়ে আমরা হন্‌হন্ ক'রে বন থেকে বেরিয়ে ওই যে মাঠ, ওই মাঠ পেরিয়ে এই জঙ্গলে ঢুকতেই আঁধার ঘনিয়ে এলো। এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের শব্দ! পেছন ফিরে দেখি, অনেকগুলো পুলিশ আমাদের পেছনে তাড়া ক'রে ছুটে আসছে। জঙ্গলে বাঘ আর মাঠে পুলিশ, আমরা কোন্ দিক সামলাই, তাই প্রাণের ভয়ে এক-একটা গাছের ওপর আমরা এক-একজন উঠে লুকিয়ে ছিলুম, কিন্তু আমরা লুকোলে কি হবে, যম যে আমাদের ডাক দিয়েছে, উঃ, বড় পিপাসা!···কৈ, জল কৈ? জল আসবার আগে যদি প্রাণটা বেরিয়ে যায়, তাহ'লে মরবার পরেও আমার মুখে

একটু ঠাণ্ডা জল দিও, এইটুকুই তোমার কাছে আমার শেষ মিনতি।”

এই কথা ব'লে কাঠুরিয়া চোখ বুঁজলে। চ্যাং বললে, “তোমার গায়ে অত রক্ত এলো কোত্থেকে?”

হাঁপাতে-হাঁপাতে কাঠুরিয়া বললে, “ওই যে বললুম গো, যম! যমের দূত গুলী হ'য়ে এসে আমার পিঠে সেঁধিয়েছে! কৈ, জল দিলে না?…”

দলের লোকের দিকে ফিরে চ্যাং বললে, “এখন আমাদের অপেক্ষা করবার সময় নেই। পুলিশ…পুলিশ…পুলিশগুলোকে পাকড়াও করতে হবে। হাতিয়ারগুলো বাগিয়ে ধরে চলে আয় সবাই আমার সঙ্গে ওই মাঠের দিকে। একজন শুধু এখানে থাক্, লিং জল নিয়ে এলে তখনও যদি এ-লোকটা বেঁচে থাকে ত' এর মুখে একটু জল দিস্।”

এই কথা ব'লে দলবল নিয়ে খানিকটা এগিয়েই চ্যাং বললে, “তোদের ভেতর থেকে মাত্র একজন লোক আমার সঙ্গে আয়, বাকি সবাই টর্চ্চের আলো ফেলে জঙ্গলের প্রত্যেক গাছ তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখ্। এইসব গাছে-গাছে আরও কাঠুরেদের পেলে তাদের আটক ক'রে—যেসব কথা এই কাঠুরেটা বলতে পারলে না সেই কথাগুলো আদায় করবার চেস্টা করবি।”

মাত্র একজন লোক সঙ্গে নিয়ে চ্যাং জঙ্গল পেরিয়ে মাঠে পৌঁছল, তারপর যেদিক থেকে বন্দুকের শব্দ আসছিল সেই

দূর দিগন্তের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। আগে-আগে চলেছে চ্যাং, তার পেছনে তার চেলা। ক্রমাগত টর্চ্চের আলো ফেলতে ফেলতে যখন তারা মাঠের শেষ-বরাবর এগিয়ে এসেছে, এমন সময় একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে চ্যাং হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে চেলা-চীনেটা থমকে থেমে গেল। তারপর হাতের টর্চ্চ জ্বেলে সে যা দেখলে তাতে সে তার বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেললে। চ্যাং নেই, অথচ চ্যাংয়ের গলার স্বর ভেসে আসছে এক অন্ধ-গম্ভীর খাদের ভেতর থেকে।

চেলা জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কোথায়?"

পাতালপুরী থেকে জবাব এলো, "তা কি ছাই আমিই জানি? তবে আমি আছি। মরিনি, বেঁচে আছি।"

চেলা বললে, "বেঁচে যে আছ প্রভু, তা ত' তোমার গলার আওয়াজ শুনেই আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু, তোমাকে আমি উদ্ধার করব কি ক'রে?"

নীচে থেকে জবাব এলো, "শত্রুদের বেঁধে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের কোমরে যে দড়ি জড়ানো ছিল, সেকথা এই বিপদের সময় ভুলে যাচ্ছিস কেন? কাছাকাছি কোনো একটা গাছের গুঁড়িতে তার একটা মুখ বেঁধে, আর-একটা মুখ ঝুলিয়ে দিলেই সেই দড়ি বেয়ে আমি ওপরে উঠতে পারবো।"

চেলা বললে, "বেশ বলেছ প্রভু! সে-দড়ি ত' শত্রুদের বেঁধে নিয়ে যাবার জন্যে। সে-দড়িগাছটি খোয়াবার সঙ্গে-

সঙ্গে যদি শত্রু এসে পড়ে তখন আমি সাম্‌লাবো কেমন ক'রে ?"

একটা শ্রুতিমধুর গালাগালি এমন তীব্র তেজে ছুটে এসে চেলার কানে বিঁধলো যে, তার ধাক্কায় সে টলে পড়তে পড়তে কোনরকমে তাল সামলে নিয়ে বললে, "শুধু শুধু আমাকে ধম্‌কাচ্ছো কেন মঁশাই ! আমি ত' আমার বাপের একটি মাত্র ছেলে, সবেধন নীলমণি, ও-গাল আমাকে লাগবে না, তার জন্যে নয়, কিন্তু হঠাৎ তুমি কর্পূরের মত উবে গেলে কেমন ক'রে সেইটেই ত' হচ্ছে আমার সব-চেয়ে ভয়ের কারণ।"

এবারে গলার স্বর একটু মিষ্টি ক'রে নীচে থেকে চ্যাং জবাব দিলে, "ভয়ের কারণ কিছুই নেই। টর্চটা হঠাৎ হাত থেকে ছিট্‌কে পড়েছিল বলে অন্ধকারে ব্যাপারটা এতক্ষণ ঠিক বুঝতে পারছিলুম না। এখন দেখছি, মুখে ঘাস-জড়ানো কতকগুলো ভাঙা প্যাঁকাটি আমার সারা গায়ে বিঁধে আমাকে একেবারে আড়ষ্ট ক'রে রেখেছে। শত্রুদের মাথা আছে বটে ! বেটারা প্যাঁকাটির মুখে ঘাসের গোছা বেঁধে জমির ঘাসের সঙ্গে সমান ক'রে ফাঁপিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল, চলতে চলতে না-জেনে তার ওপরে পা দিতেই বরাবর পাতালে নেমে এসেছি। ওসব কথা পরে শুনিস, এখন যা বললুম চট্ ক'রে তাই করে ফ্যাল্। দড়িটা শীগ্‌গির কাছাকাছি কোনো গাছে বেঁধে, বাকি-মুখটা এই গর্তের ভেতর ঝুলিয়ে দে।"

—"তাই করি" ব'লে কোমরে-জড়ানো লাক্‌লাইন দড়ির পাক খুলে, চেলা-চীনেটা পাশের একটা গাছের গোড়ায় শক্ত করে বেঁধে, বাকি-মুখটা চ্যাংয়ের উদ্দেশে গর্ত্তের মুখ দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে। তারপর গর্ত্তের মুখে ঝুঁকে প'ড়ে যেমনি জিজ্ঞেস করেছে, "দড়ি ধরেছ প্রভু ?"

—"ধরেছি বৈকি !" উত্তর এলো নীচে থেকে নয়, জমির ওপরে, একেবারে তার পেছন থেকে। এবং যে উত্তর দিলে সে শুধু উত্তর দিয়েই ক্ষান্ত হলো না, সঙ্গে সঙ্গে কড়াক্কড় ক'রে চেলাটিকে বেঁধে, তারপর তিন চারজন লোক মিলে তাকে কাঁধে তুলেই সেখান থেকে চম্পট দিলে।

চেলার বাহকরা যেখানে এসে তাকে নামালে, তার চোখ বাঁধা ছিল বলে সে-জায়গাটা সে দেখতে পেলে না, এবং সেখানকার একজন লোক যখন তাকে জিজ্ঞেস করলে, "তোর নাম কি ?" মুখ বাঁধা ছিল ব'লে সে-প্রশ্নের জবাব দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হ'লো না।

—"গুল্‌জারসিং, ওর চোখ-মুখের বাঁধন খুলে দাও।"

সঙ্গে-সঙ্গেই হুকুম তামিল করা হ'লো। দেখা গেল, বন্দীটি একজন কুৎকুতে-চোখ, হল্‌দে রংয়ের চীনেম্যান। তার থ্যাব্‌ড়া নাকের ওপর ছোট্ট একটি আল্‌গা ঘুসি মেরে একজন কনষ্টেব্‌ল্‌ ব'লে উঠলো, "কথাটা কি গ্রাহ্য হ'লো না ? তোর নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছে কতক্ষণ আগে ?"

'য়্যাং-ব্যাং-চ্যাং' ব'লে কি যে সে বললে তার একবর্ণও বোঝা গেল না।

রিভলভার হাতে দলের সর্দ্দার তার কাছে এগিয়ে এসে ভাঙা-হিন্দীতে তাকে বুঝিয়ে বললে, তাদের কথামত কাজ করলে তাকে তারা প্রাণে মারবে না, কিন্তু অবাধ্য হলেই এক গুলীতে তাকে সাবাড় ক'রে দেবে।

প্রাণের ভয়ে সর্দ্দারের কথায় সে সম্মতি জানালে। তারপর তাকে অগ্রণী ক'রে কনষ্টেব্‌ল্‌দের নিয়ে সর্দ্দার চলল, যেখানে গুপ্ত-সুড়ঙ্গপথে কাউন্ট ফার্ণাণ্ডোর গুপ্তচররা ওৎ পেতে বসে আছে সেইখানে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর একটা ঘন ঝোপের পাশে এসে চীনেম্যানটা আঙুল দিয়ে যে-জায়গাটা দেখিয়ে দিলে, সেই জায়গাটাই এদের দরকার।

সর্দ্দারের ইঙ্গিতে এবারে চীনেম্যানটার শুধু হাত দুটো বাঁধা হ'ল। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে সুড়ঙ্গ-পথের পেছন দিকে—যেখানে মাত্র দু'জন প্রহরীকে পাহারায় রেখে চ্যাং পুলিশ-পাক্‌ড়াও করতে বেরিয়েছিল, ঠিক তার বিশ গজ পেছনে পা টিপে-টিপে এসে দাঁড়ালো সকলে।

মৃদুকণ্ঠে সর্দ্দার ডাকলে, "গুলজারসিং ?"

—"হুজুর ?"

দলের ভেতর থেকে বাছা-বাছা দু'জন কনষ্টেব্‌ল্‌কে পাঠাও,

ওরা চুপি-চুপি পেছন দিক থেকে গিয়ে ঐ দুটো আলখাল্লা-পরা চীনেকে জাপ্টে ধরুক। ওদের পেছনে থাকবে তুমি আর কাল্লুসিং, তারপর টর্চ্চ আর রিভলভার ত' আমার হাতে রইলই।"

—"যো-হুকুম হুজুর!" বলেই গুলজারসিং তার কর্ত্তব্য ঠিক ক'রে নিলে।

আফিমের নেশায় বোধহয় চীনে-প্রহরী দুটো ঢুলছিল, সহসা পেছন থেকে তাদের ওপর অবাঞ্ছিত আক্রমণ হতেই তারা 'কেঁউ-মেঁউ' ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল।

—"বেটাদের মুখ দু'টো আগে কষে বেঁধে ফেল।" ব'লে টর্চ্চের আলো তাদের দিকে ফেলতে ফেলতে সর্দ্দার এগিয়ে এলো।

চীনে-প্রহরী দু'টোর আফিমের নেশা তখন দেশ ছেড়ে পালিয়েছে বোধহয়, তাই গুলজারসিং আর কাল্লুসিং যখন তাদের দু'জনের হাতে দড়ি বাঁধবার উপক্রম করছে, তারই এক ফাঁকে বেঁটে চীনে-প্রহরীটা সহসা একটা তুড়্‌কি লাফ দিয়ে উঠে মারলে সজোরে কাল্লুসিংয়ের নাকের ওপর একটা বিরাশী-ওজনের ঘুসি!

অপ্রস্তুত কাল্লুসিং অকস্মাৎ সেই ঘুসির বহর সহ্য করতে না পেরে ধড়াস্ ক'রে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল, আর সঙ্গে-সঙ্গে সর্দ্দার ছুটে এসে বেঁটে-চীনেটার হাতের কব্জিতে রিভলভারের বাঁট দিয়ে দিলে বসিয়ে সজোরে দু'চার ঘা।

সর্দ্দারের সেই ঘা সহ্য করতে না পেরে কল্কিকাবু চীনেটা 'এ্যঞ্চু-ম্যোঞ্চু' শব্দ করতে করতে সটান লুটিয়ে পড়ল সেই ঘাস-জমির ওপর।

এখন আর কনষ্টেব্‌ল্‌দের পায় কে! তারা সবাই মিলে চীনে দু'টোকে বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়ে বরাবর সুড়ঙ্গ-পথের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

সুড়ঙ্গ-পথের সরু গলিটা দশ গজ আন্দাজ সোজা গিয়ে বেঁকে গেছে চওড়া হ'য়ে। এতক্ষণ মানুষের পেছনে মানুষ, মানুষের কাঁধে মানুষ লাইন দিয়ে আসতে আসতে তাদের দম্ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল, এবার ওই চওড়া-পথে পৌঁছে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু হায়! চওড়া-পথের মুখে পৌঁছবার আগেই বজ্রগম্ভীরস্বরে আদেশ এলো, "দাঁড়াও!"

সুড়ঙ্গের সেই চওড়া-পথে দাঁড়িয়ে দু'দুজন বিভীষণ দীর্ঘকায় লোক—দেখে আন্দাজ করা শক্ত যে তারা কি জাত, পেশোয়ারি কি কাবুলি! সে যাই হোক, তারা উত্তেজিত হ'য়ে তাদের ভাষায় গম্ভীরস্বরে বললে, "দাঁড়াও! আর এক পা এগিয়েছ কি এই বর্শার ফলা ছুটে গিয়ে তোমাদের পরপারের পথ দেখিয়ে দেবে।"

সেই সঙ্কীর্ণ পথে নিজেদের নিরুপায় অবস্থার কথা ভেবে সকলেই থমকে থেমে গেল।

সবার আগে রিভলভার-হাতে দাঁড়িয়ে আছে, সিপাই-দলের দীর্ঘকায় সর্দ্দার।

সর্দ্দার রুক্ষকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, "কে তোমরা ?"

পেশোয়ারি-গুণ্ডারা তাদের ভাষায় জবাব দিলে, "সে কৈফিয়ৎ দিবি তোরা, আমরা নই। তোরাই আমাদের ওপর চড়াও হ'য়ে এসেছিস্! তোর কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে তুই-ই বল্, তোরা কারা ?"

সর্দ্দার বললে, "তোদের চোখ নেই ? পুলিশের পোষাক দেখেও বুঝতে পারছিস না, আমরা কারা ?"

বিকৃত হাসি হেসে সুড়ঙ্গের প্রহরীটা বললে, "ও, তাই বল্! তোদের নেমন্তন্ন করতে আমরা লোক পাঠিয়েছি, তার আগেই তোরা এসে পৌঁছে গেছিস্ ? বেশ, বেশ।" বলেই একটু উঁচু হ'য়ে সর্দ্দারের পেছনে একটা লোককে কি ইঙ্গিত করতেই সে পেছন থেকে এসে হঠাৎ খপ্ ক'রে সর্দ্দারের হাতের রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে, সুড়ঙ্গের প্রহরীদের হাতে ছুঁড়ে দিতেই যে সামনে ছিল সে রিভলভারটা লুফে নিলে।

যে-লোকটা এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করলে সে হয়ত বিশ্বাসঘাতক নাও হতে পারে। কারণ, সে হচ্ছে বিপক্ষ দলের লোক, সেই বেঁটে চীনে-প্রহরীটা। এদের তর্কের মাঝে সময় ক'রে নিয়ে কি ক'রে যে সে তার হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছিল কে জানে! রিভলভারটা ছুঁড়ে দিয়েই সে-

লোকটা এক ছুটে বিপক্ষের দলের ভেতরে গিয়ে হাজির হ'ল।

এখন সামনা-সামনি দু'টো দল। এক দলে তিনজন লোক, তাদের মধ্যে দু'জনের হাতে দুটো বর্শা ও একটা রিভলভার, আর-এক দলে সতেরো জন লোক থাকলে কি হবে, শুধু লাঠি ছাড়া তেমন মারাত্মক অস্ত্র তাদের কাছে আর কিছুই নেই।

বাধলো সেই অন্ধকারে দুই দলে তুমুল যুদ্ধ। নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে কনষ্টেবল্‌দের সর্দ্দার মরীয়া হ'য়ে মারলে এক লাফ। তার লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। তখন চলল দু'জনে দারুণ ধ্বস্তাধ্বস্তি। ঠিক সেইসময় একটা অঘটন ঘটে গেল। সর্দ্দারের বিপদ বুঝে সিপাই-দলের ভেতর থেকে একজন পেশোয়ারি-গুণ্ডার মাথা লক্ষ্য ক'রে তার হাতের মোটা লাঠিটা ছুঁড়ে মারলে। কিন্তু ধাবমান লাঠিটা তার মাথায় না লেগে লাগল, সুড়ঙ্গ-পথের বাঁকের মুখে অল্প-পরিসর ও অধিক-প্রশস্ত মোড়ের ঠিক সন্ধিস্থলে মাথার ওপর যে ক্ষীণ আলোটা মিট্‌মিট্‌ ক'রে জ্বলছিল, তাতে। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে আলোর কাঁচের ডুম্‌টা ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে সেই বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারকে চিরে-চিরে ফুটে উঠল, একাধিক সিপাইদের হাতের টর্চ্চের আলোর তীব্র জ্যোতি! সে এক তুমুল কাণ্ড! কুরুক্ষেত্রে ভীম-দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধের মত মহামারী ব্যাপার! সেখানে কেউ সমঝদার

দর্শক থাকলে তার মনে হ'ত, যেন ছবিঘরের পর্দার ওপর জ্যোতির্ম্ময় আলোর ফোকাসে দু'টি মল্লবীরের দ্বৈরথ সমর চলেছে। কে কার ঘাড়ে ওঠে, কে কাকে নীচে ফেলে! খুব ঠাহর ক'রে দেখলেও ঠিক বোঝা যায় না যে কোন্‌টা কে! পেশোয়ারি-গুণ্ডাটা এবার বোধহয় সিপাই-সর্দ্দারকে কায়দা ক'রে নীচে ফেলে তার বুকের ওপর হাঁটু দিয়ে ব'সে তার গলা টিপে ধরলে। পরমুহূর্ত্তেই এ কি? সিপাই-সর্দ্দারের একটি যুযুৎসু-প্যাঁচের অব্যর্থ কৌশলে ডিগ্‌বাজি খেয়ে উল্টে গেল পেশোয়ারি-গুণ্ডা! তারপর কখনো এ-ওর বুকে উঠে বসে, কখনো ও-একে চিৎ ক'রে ফেলে গলা টিপে ধরে।

সিপাইদের হাতের টর্চ্চের আলো সমানভাবেই জ্বলছে আর নিভছে। এরই এক-ফাঁকে দেখা গেল, দু'জনের মধ্যে কে একজন তার পায়জামার জেব থেকে একটা ইন্‌জেক্সানের পিচ্‌কিরি বের ক'রে আর-একজনের বুকের পাঁজ্‌রার পাশে প্যাট্‌ ক'রে বিঁধে দিলে। তারপরেও কিছুক্ষণ চলল সেইরকম আঁচ্‌ড়া-আঁচ্‌ড়ি, কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি। তারপর আচম্বিতে জেগে উঠল বাইরে থেকে একটা ক্রুদ্ধ বাঘের ভীষণ গর্জ্জন! মনে হ'ল, জানোয়ারটা যেন সুড়ঙ্গের মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। তারপর কে কাকে দেখে, আর কে কার খোঁজ নেয়! দারুণ আতঙ্কে দু'চোখ মুদে সিপাইরা দিলে তাদের হাতের টর্চ্চের বাতি নিভিয়ে। তারপর দু'টি বিপক্ষদল একসঙ্গে মিশে গিয়ে

পরস্পর বোধহয় আলিঙ্গনে বদ্ধ হ'য়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল।

সময়ের দাম এখন অনেক বেশী। প্রতি মুহূর্তে এখানকার যে-কোনো মানুষের প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেলেও আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

সেই মুহূর্তে দুই দলের মধ্যে কে-একজন বুদ্ধিমান নিজেদের শত্রুতার কথা বিস্মৃত হ'য়ে, বিপুল শক্তিতে সেই সুড়ঙ্গ-পথের মোহনার লোহার ফটক ঝন্‌ঝনাৎ শব্দে বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর সেখানে আটকে রইল শুধু অন্ধকার! বিশ্বগ্রাসী জমাট অন্ধকার!

একঘণ্টা পরে।

এত তোড়-জোড় ক'রেও সিপাই-সর্দ্দার কিছু সুবিধে করতে পারলে না বোধহয়।

সুড়ঙ্গ-পথের ঘাঁটি-ঘরে একটা কেরোসিনের লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো থেমে-থেমে দপ্‌দপ্ ক'রে জ্বলছিল। সেই নিবু-নিবু বাতির স্বল্পালোকে দেখা গেল, চারজন পোষাক-পরা পুলিশ-কনষ্টেবল্ আফিমখোরের মত বসে-বসে ঝিমোচ্ছে। তাদের কোমরে ও হাতে-পায়ে বেশ শক্ত ক'রে দড়ি বাঁধা।

এমন বন্ধন-দশায় প'ড়েও এই বন্দীদের চোখে এত রাজ্যের ঘুম আসছে কোত্থেকে কে জানে! তাদের প্রহরায় নিযুক্ত

বর্শা-হাতে ওই ষণ্ডামার্কা চীনেম্যানটা কিন্তু পায়চারি করতে করতে ওদের দিকে বাঁকা-চোখে চেয়ে-চেয়ে হেসে নিচ্ছে খুব! মাঝে-মাঝে বোধহয় বন্দীদের সচেতন ক'রে তোলবার জন্যে বর্শার গোড়ার দিক দিয়ে মারে একটা ক'রে খোঁচা, আর রক্তজবার মত লাল চোখ মেলে বন্দীরা শুধু মাতালের মত মাথা দোলায়। তার অর্থ বোধহয় এই হবে যে, 'ক'রে নাও বাবু, যা-খুশি তোমাদের, কিন্তু মনে রেখো, য়্যায়সা-দিন নেহি রহেগা!'

হঠাৎ ঘরের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। আর-একজন বর্শা-হাতে চীনে-প্রহরী এসে আগের প্রহরীকে অভিবাদন জানালে।

একনম্বর প্রহরী তার ভাষায় জিজ্ঞেস করলে, "সময় হয়েছে?"

দ্বিতীয় প্রহরী জানালে, "না, এখনো হয়নি। তবে হবার উপক্রম হ'চ্ছে মনে হয়।"

প্রথম প্রহরী বললে, "হুসিয়ার! ঠিক সময়ে ঠিক খবর পেতে এতটুকু দেরী হ'লে······বুঝলে? এক-একটা মাথার দাম এখন দশ-দশ লাখ্ রুপেয়া···মনে থাকে যেন। যাও।"

দ্বিতীয় প্রহরী তার ভাষায় জানালে, "হ্যাঁ, সে বুঝেছে।" তারপর আবার বিদায়-অভিবাদন জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

···দু'হাতে দু'টো রিভলভারের আবির্ভাব হ'ল··

পৃষ্ঠা—৯২

প্রথম চীনে-প্রহরীটা আবার আগের মত বর্শা-হাতে পায়-চারি ক'রে বেড়াতে লাগল। একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, চীনেটা খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। তার সগর্ব্ব পদক্ষেপ দেখলে অনুমান করতে দেরী হয় না যে, সে মস্ত বড় একটা যুদ্ধ জয় ক'রে তার পুরস্কারের আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠেছে। সে অস্থির···সে চঞ্চল···সে······

···এ-খবর যখন কাউন্টের কানে পৌঁছবে, তখন? কাউন্ট ফার্ণাণ্ডো···মর্ত্তে ঈশ্বরের শূন্য-সিংহাসনের অবিসম্বাদী অধিকারী বিশ্বজয়ী-বৈজ্ঞানিক কাউন্ট ফার্ণাণ্ডো···

এমন সময় আবার দরজা খোলার শব্দ! সেই চীনে-প্রহরীটা এসে ঠিক-সময়ের গুরুত্ব জানিয়ে দিলে।

প্রথম প্রহরীটা উল্লাসে উন্মত্ত হ'য়ে তার ভাষায় ব'লে উঠল, "জয়! বৈজ্ঞানিক কাউন্ট ফার্ণাণ্ডো-কি জয়!" তারপর এক-একটা খোঁচা মেরে কনস্টেবল্‌দের সচেতন ক'রে তুলে দিয়ে, তাদের চারজনকে আবার একটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে হিড়্‌হিড়্‌ ক'রে টেনে নিয়ে যেতে-যেতে বললে, "আমাদের আর-সব লোক?"

দ্বিতীয় প্রহরী বললে, "বাইরে সবাই হাজির আছে।"

তারপর হাত-পা-বাঁধা কনস্টেবল্‌ চারজন নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করলে। তাদের মৌন-মুখে ভাষা নেই। তারা কালা··· তারা হাবা···তারা বোবা······

বারো

পুলিশ-দলকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে চ্যাংকে পাঠিয়ে দিয়ে কাউণ্টের মুখে খানিকটা আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

তারপর হীরেনের দিকে ফিরে সে বললে, "তাহ'লে সমস্ত ব্যাপারটা আপাতত কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ রাখতে হ'ল বন্ধু! তোমার অপর তিনটি বন্ধুকে তাদের যথাযোগ্য স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি। একজন রয়েছে তার দোদুল্যমান শিকলটির পাশে; একজন রয়েছে তার কবরের কাছে অন্তিম-শয়নের প্রতীক্ষায়; আর, ইন্‌স্পেক্টর-বন্ধুটির জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এক সাক্ষাৎ নরক!

একটা প্রকাণ্ড বাঁধানো-চৌবাচ্চা, তার ভেতর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অসংখ্য জোঁক, কাঁকড়া-বিছে ও সাপ। তারই পাশে ইন্‌স্পেক্টরকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। মুহূর্ত্তের ইঙ্গিতেই তাকে তার ভেতর ফেলে দেওয়ার উপক্রম করা হবে,—সে তাদের নাগালের কাছাকাছি উপস্থিত হ'য়ে জোঁক ও বিছের খস্‌খসানি আর সাপের ফোঁসানি শুনতে পাবে—আতঙ্কে সে শিউরে উঠবে···তার দম্ বন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু খানিকক্ষণ যখন সব-কিছু ক্রিয়া-কর্ম্মই বন্ধ রাখা হ'ল, তখন চল বন্ধু, তোমাকে আমার এই পাতালপুরীর সেইসব আয়োজন দেখিয়ে দিচ্ছি। এসব দেখবার সৌভাগ্য জীবনে আর কখনো তোমার হবে না—বন্ধুদেরও একবার শেষ দেখা দেখে নাও। এর মাঝে ভাগ্যক্রমে যদি তোমার বাকি পুলিশ-বন্ধুদের খোঁজ পাই, তাহলে ত' চমৎকার! চল, সময় থাকতে তোমাকে এখুনি সব-কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি।"

এই ব'লে সে তার বিশালদেহ-অনুচরকে কি কতকগুলো কথা বললে। সে তখুনি হীরেনকে টেবিলে-শোয়ানো অবস্থাতেই ঠেলে নিয়ে চললো কাউণ্টের পিছু-পিছু!

না-জানি আবার কোন্ দৃশ্য চোখে পড়ে, আবার কোন্ নতুন অভিজ্ঞতা হয় এই ভেবে হীরেনের সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল।

হীরেন আজ আর তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না—এমনি সব অভাবনীয় দৃশ্য!

সে দেখে এসেছে অজিতবাবুকে—দোদুল্যমান শৃঙ্খলের পাশে মরণ-দোলায় দোল খাবার জন্যে সে ভয়ার্ত্তভাবে শেষ আদেশের প্রতীক্ষা করছে। সে দেখেছে অরুণবাবুকে—অন্ধকার গহ্বরের পাশে শেষ-সমাধিলাভের আশায় সেও প্রতিটি মুহূর্ত্তে জীবনের কষ্টকর নিঃশ্বাস ফেলতে-ফেলতে হাঁপিয়ে উঠছে।

সর্ব্বশেষে তাকে নিয়ে আসা হ'ল পৃথিবীর বাস্তব-নরকে। নরকের তীরে হাত-পা-বাঁধা বীরেনবাবু অদূরে নারকীয় দৃশ্য দেখছিলেন আর তাঁর জীবনের শেষ হিসাব-নিকাশ করছিলেন।

হীরেন দেখলে, নরকের জোঁক, কাঁকড়া-বিছে ও ছোট-বড় নানারকম সাপ তাদের শিকারের আশায় উন্মুখ হ'য়ে বাঁধানো-চৌবাচ্চায় কিল্‌বিল্‌ ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে, আর দুর্দ্দান্ত সাহসী বীরেনবাবু দু'চোখ বুঁজে ভয়ে স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছেন।

হীরেনের মনে হ'ল, কাউণ্টের উদ্ভাবনী-শক্তির তুলনা নাই। আতঙ্কে হৃৎক্রিয়া বন্ধ করবার পক্ষে এ নারকী-দৃশ্য সত্যিই যথেষ্ট! হাত-পা-বাঁধা একটা অসহায় লোককে মাত্র এক ফুট নামিয়ে দিলেই—সাধ্য কি সে আর প্রকৃতিস্থ থাকতে পারে। ভয়ে তার দু'চোখ বন্ধ হ'য়ে এলো।

কাউণ্ট তা বুঝতে পেরে বললে, "মূর্খ গোয়েন্দা আর মূর্খ ইন্‌স্পেক্টর! ভেবেছিলে, পৃথিবীতে তোমরা সবচেয়ে বুদ্ধিমান্‌ আর সবচেয়ে সাহসী! কিন্তু ডাঃ হিরোতার ক্ষমতার কাছে তোমরা ও তোমাদের সমগ্র পুলিশ-বাহিনী অসহায় পুতুল মাত্র।

মূর্খ! তোমাদের সবাইকে অমর করবার জন্যে আমি যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেছি, তাতে আমার মহত্ত্বই প্রকাশ হচ্ছে মাত্র। তোমাদের সেজন্যে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আপাতত

আমার প্রক্রিয়ায় তোমাদের কিছুক্ষণের জন্যে মৃত্যু ঘটলেও হয়তো আবার তোমরা বেঁচে উঠবে বিজ্ঞানের এক অপূর্ব্ব আশীর্ব্বাদ নিয়ে। আমিই প্রমাণ করব যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ......"

কিন্তু কাউণ্টের কথা শেষ হবার আগেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। হঠাৎ একটা চাপা ক্রুদ্ধ-গর্জ্জনের সঙ্গে ঘরের পরদাটা একটু দুলে উঠল। তার পরমুহূর্ত্তেই সেই পরদাটার পেছন থেকে পাঁচটা বিশালদেহী চীনেম্যান আর সঙ্গে তাদের শৃঙ্খলিত চারটি কনষ্টেবল্ আবির্ভাব হ'ল।

—"বটে! এত বড় দুঃসাহস!" বলেই কাউণ্ট তার পকেট থেকে রিভলভার বার করলে।

তেরো

সহসা এ-দৃশ্য দেখবার জন্যে হীরেন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এর পরে যা ঘটবে তা বুঝে নেবার জন্যে এখনকার এই এক মুহূর্ত্ত সময়ই তার পক্ষে যথেষ্ট। সদলবলে মরতে হবে নিশ্চিত জেনেও সে শেষ আর-একবার গর্জ্জে উঠল, "তুমি কি মনে করেছ ডাক্তার, তোমার এই পৈশাচিক-অত্যাচার আমরা নীরবে মাথা পেতে নিলেও, সকলের মাথার ওপর যিনি আছেন সেই দিন-রাতের মালিক এত পাপ সহ্য করবেন? আমাদের জীবনের মেয়াদ হয়তো শেষ হ'য়ে এসেছে, কিন্তু এর সাজা তোমাকে একদিন-না-একদিন ভোগ করতেই হবে। তবে আপশোষ এই যে, সেদিনের সে-দৃশ্য আমরা চোখে দেখতে পাব না।"

একটা বিকৃত অট্টহাসি হেসে ডাক্তার হিরোতা বললে, "ভূতের মুখে রাম-নাম!"

তারপর পাশের সেই দীর্ঘকায় চীনে-অনুচরটাকে ডেকে বললে, "দে, দে, পেছন ফিরিয়ে দাঁড় করিয়ে দে···এই মুহূর্ত্তে··· এখুনি।"

হতভাগ্য সিপাইদের চোখ থেকে ঝরঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়ল। কি তারা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারলে না। তাদের মুখের ভেতরে কাপড় ঠাসা।

'গুড়ুম্-গুড়ুম্' ক'রে পর-পর চারবার গুলীর আওয়াজ হ'ল। সঙ্গে-সঙ্গে হতভাগ্য কনষ্টেবল্‌দের বলিষ্ঠ দেহগুলো মাটিতে সটান লুটিয়ে পড়ল।

বীরেনবাবু ত' ভয়ে স্তব্ধ! চীৎকার ক'রে প্রতিবাদ জানালে হীরেন, "সাবধান শয়তান! এতবড় অবিচার কখনো ধর্ম্মে সইবে না। মনে রেখো, সমস্ত পুলিশ-বাহিনী তুমি ধ্বংস করতে পারোনি। তাছাড়া, গোয়েন্দা সমীর বোসও তোমায় ছেড়ে দেবে না কখ্‌খনো।"

কাউণ্টের মাথায় এবার খুন চেপেছে! সে চীৎকার ক'রে বললে, "বটে? এখনো আমায় শাসানো হচ্ছে? রিভল্‌ভারে এখনো দুটো গুলী পোরা রয়েছে, সে-খেয়াল আছে মূর্খ!

ওরে চ্যাং, 'দে তো, ওই দারোগাসাহেবকে ওই নরকের ভেতর নামিয়ে দে,—আর এটাকে ঠিকভাবে দাঁড় করিয়ে দে আমার সামনে। বারবার পুলিশ আর সমীর বোসের কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেছে! যত পুলিশ আর সমীর বোসই থাকুক না কেন, আজ আর আমার হাতে তাদের রক্ষে নেই। তাদের আজ…"

কাউণ্টের বক্তব্য শেষ হ'বার আগেই হীরেনের পাশের চীনেম্যানটার দু'হাতে দুটো রিভলভারের আবির্ভাব হল। সে গম্ভীরস্বরে ব'লে উঠল, "ডাক্তার হিরোতা! তুমি এবং তোমার সুযোগ্য অনুচর চ্যাং—দু'জনেই লক্ষ্মীছেলের মতন দু'হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়াও। একটুও নড়েছ কি তোমাদের প্রকাণ্ড মাথার খুলি দু'টো এই ক্ষুদে-অস্ত্রের সাহায্যে ফুটো করতে আমি একটুও ইতস্তত করব না। তোমার এই গোপন-আস্তানার সন্ধান পুলিশের কাছে আর গোপন নেই। তারা চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। সুতরাং, বুঝতেই পারছ যে তোমাদের মতন দু'টো নরদেহী-পিশাচের পালাবার আর কোনো পথই আমি উন্মুক্ত রাখিনি? এখন লক্ষ্মীছেলের মতন আমার উপদেশ পালন করলেই যথেষ্ট বাধিত হব।"

হীরেন চীনেম্যানটার সেই গলার স্বর শুনে আনন্দে দিশেহারা হ'য়ে পড়ল। তাহ'লে তাদের সবাইকে আর নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাতে আত্মবলি দিতে হ'বে না। কিন্তু এ যে বিশ্বাসেরও অযোগ্য! চীনেম্যানের ছদ্মবেশে—সমীর!

সমীর আবার চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, "দেখছ কি গুলজার সিং! তুমি এদের হাতকড়ির ব্যবস্থা কর।"

চীনেদের ছদ্মবেশে গুলজারসিং ও অপর তিনজন কনস্টেব্‌ল্ অতি সতর্কভাবে সামনের দিকে এগিয়ে এলো। সমীর তখনো রিভলভার উঁচিয়েই আছে।

কাউণ্ট বুঝলে, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। সে নীরবে নত-মস্তকে হাত এগিয়ে দিলে।

এতক্ষণে বীরেনবাবুর কথা ফুটল। তিনি বললেন, "এ কি, স্বপ্ন দেখছি সমীর ?"

মৃদু হেসে সমীর বললে, "হাঁ, প্রায় স্বপ্নই বটে। তবে তা সত্যি হয়ে উঠেছে এই অতি বুদ্ধিমান ডাঃ হিরোতারই সামান্য দু' একটা ভুলে।

ডাঃ হিরোতা বুদ্ধি বাত্‌লেছিলেন ভালই। বহুদিন আগেকার মৃত এক জলদস্যু—কাউণ্ট ফার্ণাণ্ডোর ছদ্মবেশে তিনি তাঁর অভিনয় আরম্ভ করেন। হীরেন ও অরুণবাবুর বেলায় তিনি মনে করেছিলেন, দুটো মাত্র লোক, এদের ত' অজ্ঞান করেই পাতালপুরীতে নিয়ে আসা যায়! তাই তিনি হীরেনকে মর্ফিয়া-জাতীয় ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন আর অরুণবাবুর রক্ত বার ক'রে তাঁকে দুর্বল ও অচৈতন্য করবার চেষ্টা করেন। ঘটনাস্থলে যেসব ওষুধের অবশিষ্ট ও ভাঙ্গা শিশি পড়েছিল, তা থেকে যে-কোন লোক বুঝতে পারে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোন্ শ্রেণীর লোক।

ডাঃ হিরোতার কৌশলে এরপর উদয় হ'ল একটা কাঠের তৈরি নকল কাউণ্ট! আমি প্রকাশ্যে কলকাতায় যাচ্ছি বললেও, প্রকৃতপক্ষে আমি আশে-পাশেই গা-ঢাকা দিয়ে সবদিকে নজর রেখেছিলুম। সেদিন বাইরে থেকে একটা পাথর ছুঁড়ে নকল

কাউন্টের মাথাটা বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেললুম—বাকি মূর্ত্তিটা ঘরের ভেতরেই তলিয়ে গেল। কিন্তু বুদ্ধিমান্ হীরেন তবু ঘরের মেজেটা ভাল ক'রে পরীক্ষা করলে না! কারণ, কাউন্টের প্রেতাত্মার ভয়ে সবাই তারা এত অভিভূত হয়েছিল যে, কেউ আর বাস্তব-জগতের কিছু ভাবতেই পারেনি।

তা' যদি না হ'ত, তাহ'লে মেজেটা পরীক্ষা করলেই পাতালের দিকে একটা স্প্রিংএর গুপ্ত দরজা তখুনি আবিষ্কৃত হ'ত।

ডাঃ হিরোতার সম্ভবত সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বপ্রধান ভুল হচ্ছে তাঁর অতি সাবধানতা! তিনি সম্ভবত আমাদের খোঁজ নেবার জন্যে একই সময়ে তাঁর গোপন-সুড়ঙ্গের তিনটি পথ দিয়েই লোক পাঠান্। তারপুর সুড়ঙ্গ-পথে ওঁদের দলের সঙ্গে আমাদের দলের একটা খণ্ড-যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধে ডাক্তার হিরোতার জয় অনিবার্য্য হলেও ভগবান আমাদের সহায় হলেন। জয়ের কোনো আশা নেই দেখে আমি আমার প্যাণ্টের জেব থেকে 'মর্ফিয়া-ইন্‌জেক্‌সানের' পিঁচকিরি বের ক'রে প্রথমে দলের সর্দ্দারটাকে কাবু করি, তারপর সেই প্রক্রিয়ায় বাকি লোকগুলোকেও অচেতন ক'রে ফেলি। তার ফলে লাভ হ'ল এই, তারা আমাদের হাতে বন্দী হ'ল।

আমরা তখন পোষাক বদলে তাদেরই সাজালুম সিপাই, আর আমরা সাজলুম চীনে। তারা কথা কইলে পাছে ধরা প'ড়ে

যাই সেইজন্যে তাদের মুখের মধ্যে বেশ শক্ত ক'রে কাপড় ঠেসে দিয়ে, তারপর প্রাণের ভয় দেখিয়ে তাদেরই সাহায্যে আমরা এই পাতালপুরীতে এসে হাজির হই। তারপর যা ঘটেছে আপনারা সবাই জানেন।

যাই হোক্, আমার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। নিরুদ্দিষ্ট বন্দীদের উদ্দেশ পাওয়া গেছে, এখন আর কোনো ভয় নেই। সারা পাতালপুরী ও তার সব ক'টা প্রবেশ-পথ এখন আমাদেরই হাতে। এখন আমার একটা নিবেদন আছে ডাঃ হিরোতা! আমি যা' করতে চাইনি, তুমি তা' করেছ। ঐ চারটে চীনেকে আমি খুন করতে চাইনি, কিন্তু তুমি কনষ্টেবল্ ভেবে তাদের খুন করেছ। কাজেই, তাদের মৃত্যুর জন্যেও দায়ী তুমি নিজে। ইন্‌স্পেক্টর বীরেনবাবু তোমার বিচারের ব্যবস্থা করবেন। আমরা কেবল তোমাকে তোমার পরকালে পৌঁছবার খেয়া-ঘাটে হাজির ক'রে দিয়েই খালাস। অল্-রাইট্ ডাক্তার··· গুড্-বাই!"

=শেষ=